সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. http://bn.banglapedia.org প্রকাশিত 'নাট্যকলা' শীর্ষক এন্ট্রি।
২. সেলিম আল-দীন, *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
৩. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* কলকাতা: দেজ, ২০১৪
৪. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন,* কলকাতা: রত্নাবলী, ২০১০
৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৬১
৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*

বিভিন্ন বিতর্কের জট সরিয়ে রেখে নাট্যশাস্ত্রটির রচনা/সংকলনকাল আনুমানিক **খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টাব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় শতক** পর্যন্ত একটি বিস্তৃত কালখন্ডকে নির্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমাদের মনে হয়। নাট্যশাস্ত্রে ৩৬ বা, ৩৭ টি অধ্যায়। বেশিরভাগ অংশ লেখা হয়েছে শ্লোকে (পদ্যছন্দে), সামান্য কিছু বিবৃতিমূলক গদ্যও এতে রয়েছে। অভিনবগুপ্তের সাক্ষ্য অনুযায়ী নাট্যশাস্ত্রে মোট ৩৬ টি অধ্যায়ে প্রায় ৬০০০ শ্লোক আছে। নাট্যশাস্ত্র যতটা পরিমাণে নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়কলা বিষয়ক শাস্ত্র, ততটাই ভাষা, ছন্দ ও সাহিত্যবিচার শাস্ত্রও। তার কারণটিও এই মহাগ্রন্থেই বলা হয়েছে – "এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, কলা, বিদ্যা, যোগ বা কর্ম নেই যা এই নাট্যে দৃষ্ট হয় না।"

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী নাট্যমঞ্চ:

নাট্যশাস্ত্রে ৩ প্রকার রঙ্গালয়ের কথা বলা হয়েছে। যথা: ১. **বিকৃষ্ট** (বৃহদাকার; অন্য অর্থ আয়ত) ২. **চতুরস্র** (চতুষ্কোণ/ বর্গক্ষেত্র) ও ৩. **ত্রস্য** (ত্রিকোণ)। রঙ্গালয়ের নির্মাণ ও জমির পরিমাণ সংক্রান্ত নানা কিছু নির্দেশ আছে এখানে। আছে রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষের কারুকার্য বিষয়ে আলোচনা এবং তিনপ্রকার রঙ্গালয়ের লক্ষণ নিয়ে নানান নির্দেশ।

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী নাটকের সংজ্ঞা:

যা ধর্ম, অর্থ ও যশোলাভের উপায়, সদুপদেশ ও পরম্পরাগত নীতির সংগ্রহ, যা ভবিষ্যতে মানুষের সকল কর্মের পথপ্রদর্শক, যা সর্বশাস্ত্রের অর্থযুক্ত, এবং যা সকল শিল্পের পথপ্রদর্শকহবে তাই নাট্য। বিবিধ ভাবযুক্ত, নানা অবস্থার ও মানুষের কর্মের অনুকরণাত্মক, উত্তম, মধ্যম ও অধম লোকের কর্মাশ্রিত, মঙ্গলকর, উপদেশাত্মক, ধৈর্য, ক্রীড়া ও সুখাদিকারক হল এই নাটক।

ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী নাটকের উদ্দেশ্য:

১. যারা অধর্মে প্রবৃত্ত তাদেরকে ধর্ম, যারা কামাসক্ত তাদেরকে কাম, যারা উদ্ধত তাদের শাসন, যারা বিনীত তাদেরকে আত্মসংযম, নিস্তেজ ব্যক্তিকে সাহস, বীর ও মানী লোককে উৎসাহ, মূর্খদেরকে জ্ঞান, এবং পন্ডিতগণকে প্রজ্ঞা সম্বন্ধে উপদেশ দেবে এই নাটক।
২. সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে বিলাস, দুঃখাতদেরকে স্থৈর্য, অর্থোপজীবীদেরকে অর্থ এবং উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিদেরকে ধৈর্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবে এই নাটক।সুতরাং, এই সংসারে যারা শোকদুঃখাভিহত, অতিশ্রমকাতর, শোকার্ত ও তপস্বী তাঁদের জন্য বিশ্রামজনক হবে এই নাটক। এই নাটক হবে ধর্মসম্মত, যশপ্রাপক, আয়ু ও শুভবুদ্ধিবর্ধক এবং উপদেশজনক।

এই হলো ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত বিষয় ও নাটক সম্পর্ক প্রাচীন ধারণা। এবার নাটকের ইতিহাসে আমরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করবো।

কাকে বলে নাট্যকলা?

যেকোন ত্রিমাত্রিক আয়তনে এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক অপর এক বা একাধিক ব্যক্তির সামনে কোন ক্রিয়া উপস্থাপনকেই 'নাট্য' বলা যেতে পারে। উল্লিখিত উপস্থাপনাটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবে পূর্বনির্ধারিত এবং লিখিত পাঠভিত্তিক, অথবা হতে পারে তাৎক্ষণিক উপায়ে মৌখিকভাবে সৃষ্ট। এমনকি এ দুয়ের মধ্যে থাকতে পারে অগণিত বৈচিত্র্যপূর্ণ রীতি-প্রকরণ। নাটক সৃষ্টিতে গঠন-কৌশল বিচারে দ্বন্দ্ব কোন অপরিহার্য উপাদান নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে বাংলাদেশের নাট্যরীতির ক্রমবিকাশ বৃহত্তর দক্ষিণ এশীয় নাট্য ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত এবং এর সঙ্গে পরবর্তীতে কিছু মাত্রায় ইউরোপীয় প্রভাবের মিশ্রণ লক্ষণীয়। নাট্যকলার ক্রমবিকাশ তিন ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে: (১) **সংস্কৃত ও তদুদ্ভূত নাট্যধারা, (২) দেশজ নাট্যধারা এবং (৩) ইউরোপীয় রীতি প্রভাবিত নাট্যধারা।** কিন্তু এখানে শুধুমাত্র শেষোক্ত বিভাগটিই আলোচিত হল।

আধুনিক বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্য

১৭৫৭ থেকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি সমাজে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়, যা বাংলার সকল ক্ষেত্রে বিশেষত জ্ঞানচর্চায় গুণগত পরিবর্তন আনে। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতির পৃথকীকরণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট শহুরে উচ্চবিত্তের সংস্কৃতি ইউরোপীয় আদলে গড়ে ওঠে। প্রবল জীবনী শক্তির অধিকারী এই শহুরে ইউরো-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং তার ফসল ইউরোপীয় রীতি-প্রভাবিত নাট্যচর্চা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় হারিয়ে ফেলে। অপরদিকে গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত দেশজ নাট্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশজ নাট্যের অনেক রীতির ভেতর ফসিলীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এর পাশাপাশি ইউরো-প্রভাবিত নাট্যচর্চা বেগবান হয়, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত হন ইওরোপীয় সংস্কৃতি-সচেতন শহুরে বুদ্ধিজীবীরা।

(১) ইংরেজ পরিচালিত নাট্যশালা

বাংলার সর্বপ্রথম ইংরেজ নাট্যশালা **দ্য প্লে হাউস (বা দ্য থিয়েটার) ১৭৫৩ সালে** কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা নগরী আক্রান্ত হলে তা বন্ধ হয়ে যায়। **১৭৭৫ সালে** প্রতিষ্ঠা লাভ করে **দ্য নিউ প্লে হাউস (দ্য ক্যালকাটা থিয়েটার)**। ১৮০৮ সালে বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এ মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় শেক্সপীয়র, ম্যাসিঞ্জার, কংগ্রিভ, শেরিডান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নাট্যকারদের নাটক। প্রথম অবস্থায় নারী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। কিন্তু শীঘ্রই এ রীতির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং নারীশিল্পীরা অভিনয় শুরু করেন। একে একে অন্যান্য নাট্যশালাও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। তন্মধ্যে **চৌরঙ্গি থিয়েটার (১৮১৩-৩৯)** এবং **সাঁ সুসি থিয়েটার (১৮৩৯-১৮৪৯)** ব্যাপক পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরই একমাত্র বাঙালি ব্যক্তিত্ব যিনি চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন এবং পরে তিনি এর মালিকানাস্বত্ব ক্রয় করেন। অবশ্য চৌরঙ্গি থিয়েটার পুড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি ইংরেজ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং এখানে মঞ্চস্থ হয় শেরিডান, গোল্ডস্মিথ ও শেক্সপীয়রের নাটকসহ তৎকালীন লন্ডনের অন্যান্য জনপ্রিয় ইংরেজি নাটক। এগুলির অভিনেতা, কলাকুশলী সকলেই ছিলেন ইংরেজ। সাঁ সুসি থিয়েটারের সঙ্গে বেশ কয়েকজন বাঙালি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং একজন বাঙালি অভিনেতা ওথেলো নাটকে (১৮৪৮) নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। এ মঞ্চেও শুধু ইংরেজি নাটকই মঞ্চস্থ হতো। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত সাহেবি থিয়েটারের এই ধারা অব্যাহত ছিল, যদিও স্থানীয় বাংলা নাটক উদ্ভাবনের পর থেকে সেগুলির গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

(২) লেবেদফ কর্তৃক স্থাপিত নাট্যশালা ও প্রথম ইওরোপীয় 'থিয়েটার'-এর আঙ্গিকে বাংলা-ভাষায় অভিনীত নাটক

হেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) নামক জনৈক রুশদেশীয় সঙ্গীতশিল্পী, ভাষাবিদ ও পর্যটক ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর ইউরোপীয় রীতিতে প্রসেনিয়াম মঞ্চে সম্পূর্ণ স্থানীয় কলাকুশলী (নারী ও পুরুষ) সমবায়ে **সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত নাটক মঞ্চস্থ করেন**। এটি ছিল **রিচার্ড জড্রেলের** প্রহসন **দ্য ডিসগাইজ**-এর **অনুবাদ** এবং ২৫ ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রিট) **বেঙ্গলী থিয়েটারে** মঞ্চস্থ হয়। লেবেদেফ নিজেই তা অনুবাদ করেন। এ নাটকের প্রদর্শনীতে প্রবেশমূল্য অনেক বেশি থাকলেও নাট্যশালা দর্শকে পূর্ণ থাকত। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ইউরোপীয় নাট্যচর্চা ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্কুল ও কলেজে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শেক্সপীয়রের নাটক অনুসরণযোগ্য আদর্শরূপে গৃহীত হয়।

(৩) বাবু থিয়েটার বা শৌখিন থিয়েটার (১৮৩১ -১৮৭২):

উনিশ শতকের প্রথম দিকে কিছু বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের ফলে ইউরোপীয় নাট্যরীতি আধুনিক রীতি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ফলস্বরূপ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রভাবশালী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বেশ কিছু নাট্যশালা। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেলগাছিয়া থিয়েটার (১৮৫৮-৬১) যা বাঙালিদের স্থায়ী ও আধুনিক মঞ্চ নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রথম সার্থক প্রয়াস। পাইকপাড়ার জমিদাররা তাঁদের বেলগাছিয়াস্থ বাগানবাড়িতে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এই নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালার অর্কেস্ট্রা, মঞ্চ দৃশ্যাবলি, গ্যাস ও লাইম লাইটের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাদি ছিল চোখে পড়ার মতো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয় নাট্য নির্মাণ কৌশলের কেবল অনুকরণ নয়, বরং তা আত্তীকরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কৃত নাটকের প্রাধান্য লক্ষণীয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

১৮৩১-১৮৭২ এই সময়পর্বে বেশ কিছু শৌখিন নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাট্যমঞ্চগুলির অধিকাংশই ছিল ক্ষণজীবি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের (কয়েকটি নাট্যমঞ্চ ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত) রূপ। ব্রিটিশদের থিয়েটারের অনুসরণে এই নাট্যমঞ্চগুলি সজ্জিত হত। কেউ কেউ দেশীয় শিল্পকলার মিশ্রণ-ও ঘটিয়েছেন। জনসাধারণের প্রবেশের অনুমতি ছিল না এই নাট্যশালাগুলিতে। সেকারণেএই নাট্যশালাগুলিতে অভিনীত হয়েছে যেসব নাটক তাতে নারীচরিত্রে অনেকসময়ই নারীরাও অভিনয় করেছেন। নবীন বসুর বাড়িতে অভিনীত বিদ্যাসুন্দর নাটকে নারীচরিত্রে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী আমদানী করা হয়। শৌখিন নাট্যশালার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হল।

	নাট্যমঞ্চের নাম/ স্থান	**প্রতিষ্ঠাতা**	**প্রতিষ্ঠা**	**ইংরেজি ভাষায় অভিনীত নাটক**
১.	'হিন্দু থিয়েটার'	প্রসন্নকুমার ঠাকুর	১৮৩১	'উত্তররামচরিত' (১৮৩১), 'জুলিয়াস সিজার'-এর অংশবিশেষ (১৮৩১)
৩.	লাটসাহেবের বাড়ি	হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ	১৮৩৭	মার্চেন্ট অফ ভেনিস (১৮৩৭)
৪.	বটতলা	ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমির ছাত্রবৃন্দ	১৮৫৩	দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস (১৮৫৩)
৫.	'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'	ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্রবৃন্দ	১৮৫৩	ওথেলো (১৮৫৩), মার্চেন্ট অফ ভেনিস (১৮৫৪), হেনরি দি ফোর্থ (১৮৫৫), পার্কার রচিত আমাটোর (১৮৫৫)
৬.	প্যারীমোহন বসুর বাড়ি, জোড়াসাঁকো	প্যারীমোহন বসু	১৮৫৪	জুলিয়াস সিজার (১৮৫৪)

	নাট্যমঞ্চের নাম/ স্থান	**প্রতিষ্ঠাতা**	**প্রতিষ্ঠা**	**বাংলা ভাষায় অভিনীত নাটক**
২.	নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে	নবীনচন্দ্র বসু	১৮৩৫	'বিদ্যাসুন্দর' (১৮৩৫)
৭.	'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার'	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৮৫৬	বেণীসংহার (১৮৫৭), বিক্রমোর্ব্বশী (১৮৫৭), সাবিত্রী-সত্যবান (১৮৫৮), মালতীমাধব (১৮৫৯)
৮.	ছাতুবাবুর বাড়ি	ছাতুবাবু	১৮৫৭	শকুন্তলা (১৮৫৭)
৯.	জয়রাম বসাকের বাড়ি	জয়রাম বসাক	১৮৫৭	কুলীনকুলসর্ব্বস্ব (১৮৫৭)।
১০.	বেলগাছিয়া থিয়েটার, পাইকপাড়া	প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ	১৮৫৮	রত্নাবলী (১৮৫৮), শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)
১১.	মেট্রোপলিটান থিয়েটার	রামগোপাল মল্লিক	১৮৫৯	'বিধবা-বিবাহ নাটক' (১৮৫৯)
১২.	পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটার	গোপীমোহন ঠাকুর	১৮৬০	মালবিকাগ্নিমিত্রম (১৮৬০)। **১৮৭৩ পর্যন্ত এখানে নানান নাটকের অভিনয় চলে।**
১৩.	শোভাবাজার	প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল পার্টি	১৮৬৫	একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬৫), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬৭)
১৪.	জোড়াসাঁকো থিয়েটার	গুনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলী	১৮৬৫	একেই কি বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমারী, নবনাটক ইত্যাদি। **১৮৬৫-১৮৬৭ দুবৎসর মহাসমারোহে এই থিয়েটার চলে।**

শৌখিন থিয়েটারের যুগ ও নাট্যসাহিত্যের ধারা

বাংলায় রচিত নাট্যসাহিত্যের ধারাটি প্রথম পর্বে অনুবাদভিত্তিক। হয় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নতুবা ইংরেজি ও ইওরোপীয় নাটকের অনুবাদই এই সময় নাট্যসাহিত্যের প্রধান ধারা হয়ে উঠেছে। সব রচনাই যে অভিনীত হয়েছিল এমন নয়, তবে কিছু কিছু অনুবাদ অভিনীত হয়েছিল। এই সব নাট্যকারের নাম ও অনুবাদিত নাটকের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সংকলিত হল।

অনুবাদক	নাটকের নাম	প্রকাশকাল বা, প্রথম অভিনয়	মূল উৎস
হেরাসিম লেবেডফ	কাল্পনিক সঙবদল	১৭৯৫	M. Joddrell/ 'The Disguise' (সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)
	-	১৭৯৫	Molière/ 'Love is the Best Doctor' (সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্তিবিলাস	১৮৫২	অবলম্বন William Shakespeare এর 'Hamlet'। দেশীয় রূপকথার কাঠামো মূল নাট্যকাহিনিকে প্রভাবিত করেছে।
তারাচরণ শীকদার	ভদ্রার্জুন	১৮৫২	মহাভারত-এর সুভদ্রাহরণের কাহিনি।
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতীচিত্তবিলাস	১৮৫৩	অবলম্বন William Shakespeare এর 'The Merchant of Venice'।
	কৌরববিয়োগ	১৮৫৭	মহাভারত।
	চারুমুখচিত্তহরা	১৮৬৪	অবলম্বন William Shakespeare এর 'Romeo and Juliet'।
	রজতগিরিনন্দিনী	১৮৭৪	বর্মীয় আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত ইংরেজি নাটকের অনুবাদ।
রামনারায়ণ তর্করত্ন	বেণীসংহার	১৮৫৬	ভট্টনারায়ণ/ বেণীসংহার এর অনুবাদ।
	রত্নাবলী	১৮৫৮	শ্রীহর্ষ/ রত্নাবলী –এর অনুবাদ।
	অভিজ্ঞান শকুন্তল	১৮৬০	কালিদাস/ অভিজ্ঞান শকুন্তলম –এর অনুবাদ।
	মালতীমাধব	১৮৬৭	ভবভূতি/ মালতীমাধব –এর অনুবাদ।
কালীপ্রসন্ন সিংহ	বিক্রমোর্ব্বশী	১৮৫৭	কালিদাস/ বিক্রমোর্ব্বশী –এর অনুবাদ।
	সাবিত্রী সত্যবান নাটক	১৮৫৮	কালীপ্রসন্ন লিখেছেন – "মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত্র হইতে কেবল মর্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।"
	মালতীমাধব	১৮৫৯	ভবভূতি/ মালতীমাধব –এর অনুবাদ।

রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রথম বাংলায় মৌলিক নাটক রচনা করেন। কৌলিন্যপ্রথার কুফল প্রদর্শন করে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেছিলেন *কুলীনকুলসর্ব্বস্ব* নাটক। এছাড়া *নবনাটক* (১৮৬৬), *রুক্মিনীহরণ* (১৮৭১), *কংসবধ* (১৮৭৫) প্রভৃতি এবং *যেমন কর্ম তেমনি ফল* (১৮৬৫), *উভয়সঙ্কট* (১৮৬৯), ও *চক্ষুদান* (১৮৬৯) নামে তিনটি মৌলিক প্রহসন-ও রচনা করেছিলেন। কিন্তু রামনারায়ণের নাট্যরচনা সংস্কৃতরীতিরই অনুসারী।

ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশল সাফল্যের সঙ্গে আত্তীকরণের ক্ষেত্রে এবং মৌলিক নাটক রচনায় **মাইকেল মধুসূদন দত্ত** ভবিষ্যৎ নাট্যকারদের পথ প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে *শর্মিষ্ঠা* (প্রথম মঞ্চায়ন ১৮৫৯ সালে বেলগাছিয়া থিয়েটারে এবং এর মাধ্যমে তিনি নাট্য জগতে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন), *পদ্মাবতী* (প্রথম প্রকাশ: ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন: ১৮৬৫), ঐতিহাসিক ট্রাজেডি *কৃষ্ণকুমারী* (প্রথম প্রকাশ: ১৮৬১, প্রথম মঞ্চায়ন: ১৮৬৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মধুসূদন রচিত প্রহসনগুলি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। এগুলির ভাষা সরল, অন্তর্গত ব্যঙ্গবাক্য অতি ধারাল ও যুক্তিযুক্ত এবং এতে চরিত্রসমূহ এমন চমৎকার দক্ষতায় চিত্রিত যে সকলেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান। *একেই কি বলে সভ্যতা* (প্রথম প্রকাশ: ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন: ১৮৬৫) প্রহসনে তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত অতি আধুনিক যুব সম্প্রদায়ের জীবনাচরণকে তীব্র বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর আরেকটি সার্থক প্রহসন *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (প্রথম প্রকাশ: ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন: ১৮৬৭)।

মধুসূদনের সমসাময়িক **দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩),** *নীলদর্পণ* (প্রথম প্রকাশ: ১৮৬০, প্রথম মঞ্চায়ন: ১৮৬১) নাটকে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বাংলার গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ নীলকর ও তাদের নির্মম অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। বহুজনের বিবেচনায় নীলদর্পণ প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ নাটক। এটি মেলোড্রামার অন্তর্গত হলেও সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার চিত্র এখানে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, তা তৎকালীন শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি

সমাজের নিকট অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যদিও দীনবন্ধু আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু *বিয়ে পাগলা বুড়ো* (১৮৬৬), *সধবার একাদশী* (১৮৬৬) এবং *জামাই বারিক* (১৮৭১) প্রহসনগুলির জন্য তিনি হাসির জাদুকর হিসেবে পরিচিত।

এছাড়া এসময় **উমেশচন্দ্র মিত্র** (বিধবাবিবাহ নাটক - ১৮৫৬) **রাধামাধব মিত্র** (*বিধবা মনোরঞ্জন নাটক* : ১৮৫৬), **উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়** (*বিধবোদ্বাহ নাটক* : ১৮৫৬), **তারকচন্দ্র চূড়ামণি** (*সপত্নী নাটক* : ১৮৫৮) প্রভৃতিরাও মৌলিক নাটক রচনা করেছেন।

(৪) ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা (১৮৭২)

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধিত হলে সৃষ্টি হয় এক নতুন ইতিহাস। **বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের (১৮৬০-১৮৭২)** সঙ্গে যুক্ত একদল নাট্যপ্রেমিক যুবকের উদ্যোগে কলকাতার একটি বাসভবন প্রাঙ্গণে অস্থায়ীভাবে এটি নির্মিত হয়। উল্লিখিত যুবকদের কয়েকজন পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে পেশাদার থিয়েটারের তারকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। প্রথমে এই থিয়েটারের নাম ছিল – **'The Calcutta National Theatrical Society'**। প্রথমে এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না গিরিশচন্দ্র – মতাদর্শগত বিরোধের কারণে। কিন্তু পরে তিনিও যোগ দেন।

প্রথম পেশাদারি থিয়েটার হলেও নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ছিল না ওই দলের। মধুসূদন সান্যালের ৩৬৫ আপার চিৎপুর রোডের বাড়ির একতলা ভাড়া নিয়ে খোলা হয়েছিল ওই থিয়েটার। এর ঠিক পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ঠনঠনে কালীবাড়ি অঞ্চলে কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়িতে গড়ে ওঠে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'। আবার ওই বছরেই এপ্রিল মাসে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ভেঙে তৈরি হয় 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'। সেই দলের অভিনয় হত লিন্ডসে স্ট্রিটের অপেরা হাউস ভাড়া করে। এগুলি সবই পেশাদার থিয়েটার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও, এদের কারও নিজস্ব ভবন বা রঙ্গমঞ্চ (Proscenium) ছিল না। অন্যের বাড়ি বা ঠাকুরদালান ভাড়া নিয়েই গড়ে উঠেছিল থিয়েটারের দলগুলি।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে প্রথম নিজস্ব ভবনে থিয়েটার মঞ্চস্থ করে 'বেঙ্গল থিয়েটার'। কলকাতার আর পাঁচটা পুরনো রঙ্গমঞ্চের মতো 'বেঙ্গল থিয়েটার' আজ আর না থাকলেও ওই ভবনেই রয়েছে আজকের বিডন স্ট্রিট ডাকঘর।

(৫) পেশাদারী নাট্যমঞ্চ

নাট্যমঞ্চ	প্রতিষ্ঠা	সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
বেঙ্গল থিয়েটার	১৮৭৩	ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সে যুগের বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ নামের এক নাট্যপ্রেমী পেশাদার থিয়েটার গড়তে আগ্রহী হলেন। রঙ্গালয় পরিচালন বিষয়ে তিনি একটি কমিটি গড়লেন, যার সদস্য হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যব্রত সাম্যধ্যায়ী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। বিডন স্ট্রিটে রামদুলাল সরকারের ঠাকুরবাড়ির বিপরীতে ফাঁকা মাঠে নির্মিত হল নতুন রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চটি প্রথমে ছিল খোলার চালের, পরে পাকা গাঁথনি হয়। লিউইসের লাইসিয়াম থিয়েটারের আদলে গড়ে উঠল বাংলার প্রথম নিজস্ব ভবন-সহ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 'বেঙ্গল থিয়েটার'। ঠিকানা, ৯ বিডন স্ট্রিট। বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এই থিয়েটারটিই ছিল প্রথম স্থায়ী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই থিয়েটারের প্রাণপুরুষ। তাঁর মৃত্যুর পর (১৯০১) এই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। নিজস্ব ভবন ছাড়াও বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে 'বেঙ্গল থিয়েটার' আরও দু'টি কারণে বিখ্যাত। প্রথমত, বেঙ্গল থিয়েটারই বাংলার প্রথম পেশাদার 'থিয়েটার হল' যা নির্মিত হয়েছিল জনসাধারণের শেয়ারের টাকায়। দ্বিতীয়ত, বাংলা পেশাদারি থিয়েটারে স্ত্রী-চরিত্রে মহিলা শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করানোর প্রথম নজির স্থাপন করেছিল এই বেঙ্গল থিয়েটারই। এর আগে লেবেদেভ 'দ্য বেঙ্গলি থিয়েটার' কিংবা নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ির 'শ্যামবাজার থিয়েটার'-এ মহিলারা অভিনয় করলেও সেগুলির কোনওটাই পেশাদার রঙ্গমঞ্চ ছিল না। তার পরেও, কি পেশাদার থিয়েটার, কি সখের থিয়েটার— কোনও জায়গাতেই মহিলা শিল্পীদের দিয়ে অভিনয় করানো হয়নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম

		থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে নারী চরিত্রগুলিতে নারীদের দিয়ে অভিনয় করানোর পক্ষে সওয়াল করে এলেও সমাজপতিদের রোষের ভয়ে কেউই তা করতে সাহস পাননি। কিন্তু নিজে সে যুগের এক জন অন্যতম সমাজপতি হওয়ায় ঝুঁকিটা নিতে পেরেছিলেন শরৎচন্দ্র। অথচ প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও এটি মানতে পারেননি বিদ্যাসাগর। ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি রঙ্গালয় পরিচালন কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয় দিয়ে এই থিয়েটারেরের যাত্রা শুরু হয়।
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	১৮৭৩	১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার দুটি দলে ভেঙে যায়। প্রথম দলটি (গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু ইত্যাদি) **ন্যাশনাল থিয়েটার** নামে এবং দ্বিতীয় দলটি (অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বসু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি) **হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার** নামে পরিচিত হয়। ১৮৭৩ সালের শেষের দিকে এই ধর্মদাস সুরের পরিচালনায় এই হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নামে নবগঠিত হয়। পেশাদারী এই নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠায় সিংহভাগ অর্থভার বহন করেছিলেন – ভুবনমোহন নিয়োগী। ১৮৭৭ সালে এই থিয়েটারটি মালিকানা নিয়ে নেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু তিনি লাভজনকভাবে এটি পরিচালনা করতে অসমর্থ হলে প্রতাপচন্দ্র জহুরি নামক জনৈক ব্যক্তিকে এই থিয়েটার বিক্রি করে দেন। পরে এই থিয়েটারটিরই নামকরণ হয় – মিনার্ভা থিয়েটার।
বীণা থিয়েটার	১৮৭৭	রামকৃষ্ণ রায় এই থিয়েটারটির প্রতিষ্ঠাতা।
স্টার থিয়েটার	১৮৮৩	বিডন স্ট্রিটে গুর্মুখ রায় কর্তৃক এই থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
নিউ স্টার থিয়েটার	১৮৮৮	২৫ মে ১৮৮৮ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'নসীরাম' নাটকটি দিয়ে এই থিয়েটারটির উদ্বোধন হয়। ১৯১১ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই থিয়েটারটি ভাড়া নেন। এই থিয়েটারটির মালিকানা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে।
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চ	১৮৯১	শিশিরকুমার ভাদুড়ি এই থিয়েটারে অভিনয় করেছেন।
মিনার্ভা থিয়েটার	১৮৯৩	১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্বতন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারটির মালিকানা স্বত্ব আসে নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। তিনিই মিনার্ভা থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই থিয়েটারে জীবনের শেষ অভিনয় করেছিলেন।
কার্জন থিয়েটার	১৮৯৩	শিশিরকুমার ভাদুড়ি, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতা এই থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন।

শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রবর্তন ইউরোপীয় নাট্য প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৭৩ সালে বেঙ্গল থিয়েটার নামে অপর একটি সাধারণ রঙ্গালয় আত্মপ্রকাশ করে, যা বাংলায় ইউরোপীয় রীতির সর্বপ্রথম স্থায়ী নাট্যশালা। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম মঞ্চায়ন মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকটিও ইতিহাস সৃষ্টি করে, কারণ পেশাদার ইউরো-প্রভাবিত বাংলা নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে এই নাটকেই সর্বপ্রথম নারী চরিত্রে নারীরাই (জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা) অভিনয় করেন। উল্লিখিত সাধারণ রঙ্গালয়সমূহে আলোকসজ্জার জন্য গ্যাসবাতি ব্যবহার করা হতো। ১৮৮৭ সালে এমারেল্ড থিয়েটারে সর্বপ্রথম ডায়নামোর সাহায্যে মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটে। অঙ্কিত উইংস ও ব্যাকড্রপ দ্বারা নাটকের স্থান নির্দিষ্ট করা হতো। নাটক রচনার ক্ষেত্রে পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট রোম্যান্টিক ট্রাজেডি, বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটক ছিল আদর্শ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিনয় ছিল উচ্চকিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অতিমাত্রায় আবেগাশ্রিত। এ সময়কার নাট্য প্রযোজনাগুলিতে হালকা বিনোদনমূলক নৃত্য-গীত ও কিছু চটকদার কৌশল ছিল অপরিহার্য উপাদান। সাধারণ রঙ্গালয় চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই একে ব্রিটিশ রাজের রোষানলে পড়তে হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি *গজানন্দ ও যুবরাজ* প্রহসনটি মঞ্চস্থ করার পরপরই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এর কিছু পরেই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) পাস হয়। এ আইনের মাধ্যমে সরকারবিরোধী ও প্রজাবিদ্রোহমূলক নাট্য প্রদর্শনী বন্ধ করতে পুলিশকে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি আর রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী নাট্য প্রদর্শনীতে সাহস করে নি; এমন কি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যখন গোটা জাতি উদ্বুদ্ধ, তখনও নয়। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক। অনেক আন্দোলনের পর ২০০১ সালে বাংলাদেশে এই আইনের বিলুপ্তি ঘটে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতার বাঙালি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। নাট্য ক্ষেত্রে এই প্রবণতার প্রতিফলন দেখা যায় অসাধারণ অভিনেতা ও দক্ষ পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে। তিনি প্রায় সত্তরটি নাটক রচনা করেন, যার অকেগুলিই পৌরাণিক কাহিনি ও সাধুজীবনী আশ্রিত এবং আকণ্ঠ ভক্তিরসে নিমজ্জিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র যেখানে ইউরোপীয় নাট্যের শরীর ও আত্মা দুই-ই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন, গিরিশ ঘোষ সেখানে কেবল শরীর বেছে নিয়েছিলেন, যার আদর্শ ছিল শেক্সপীয়রের নাটক। কিন্তু গিরিশ ঘোষের আদর্শগত অবস্থান ও মানসিক প্রবণতা সম্পূর্ণভাবেই ছিল কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত আশ্রিত। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকে (যেমন: প্রফুল্ল ও সিরাজউদ্দৌলা) অবশ্য হিন্দু পুনর্জাগরণের প্রভাব অনেকটা কম দেখা যায়। গিরিশ ঘোষ তাঁর নাটকে চরিত্র বিশ্লেষণ এবং অভিনয় ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা যোগ করার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বিশ শতকের শুরুতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ঐতিহাসিক কাহিনিনির্ভর দেশপ্রেমের বক্তব্য সম্বলিত নাটক অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ সময় তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখেন। পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি.এল রায়) নাট্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন, যদিও তিনি রঙ্গালয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী হিসেবে ডি.এল রায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি আত্তীকরণ করে তা ব্যবহার করেন জাতীয়তাবাদ প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে। ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ডি.এল রায় স্বার্থকভাবে তাঁর দর্শকবৃন্দের আগ্রহ পৌরাণিক ভুবন থেকে ইহজাগতিক ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক ব্যতিরেকে আলোচিত সময়ে রচিত হয়েছে অনেক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনভিত্তিক হাস্যরসাত্মক নাটক এবং গীতাভিনয় নাট্য। এ সময়ের অপর দুজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন **অমৃতলাল বসু (১৮৫২-১৯২৯)** এবং **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)**। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিদেশি ভাষায় রচিত কিছু নাটকের সফল বঙ্গানুবাদ (শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার ও মলিয়েরের লা জেন্টিলহোম) এবং কতগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। অন্যদিকে অমৃতলাল বসু ছিলেন একজন সুপরিচিত অভিনেতা। বাঙালি সমাজে ইউরোপীয় সংস্কৃতির কু-প্রভাব নিয়ে রচিত তাঁর প্রহসনগুলি তাঁকে বিশেষ খ্যাতি এনে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যচর্চার সংমিশ্রণ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়সহ আরও অনেকের সমান্তরালে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)** এমন কিছু নাটক রচনা ও পরিচালনা করেন যা দেশজ ও ইউরোপীয় নাট্যরীতির সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। মিশ্রণটি এতই সূক্ষ্ম যে এতে কোন ফাঁক চোখে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ যে প্রতীকী সাংকেতিক নাট্যরীতির উদ্ভব করেন তা প্রকৃতপক্ষে দেশজ নাটগীত-রীতি এবং ইউরোপীয় নাট্যনির্মাণ কৌশলের সংমিশ্রণ। তিনি দেশজ নাটগীত থেকে বিপুল সংখ্যক গানের ব্যবহার এবং কার্যকারণের সূত্র ব্যতিরেকে নাট্যক্রিয়া নির্মাণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন। অপরদিকে, দ্বন্দ্বভিত্তিক প্লট নির্মাণ-কৌশল এবং চরিত্র নির্মাণের কিছু সূত্রের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় নাট্যরীতির কাছে ঋণী। তাঁর নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস হিসেবে মাত্র কয়েকবার মঞ্চায়ন করা হলেও সাফল্যের মুখ দেখে নি। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে কলকাতার বহুরূপী নাট্যদল প্রথমবারের মতো প্রমাণ করে যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চে সফলভাবে মঞ্চায়ন করা সম্ভব।

সমাজ সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদমূলক নাট্যধারা

এ ধারার নাট্যচর্চার কাল বিশ শতকের বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং নাট্য জগতের দুই বলিষ্ঠ পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের মৃত্যুর পর কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে স্থবিরতা আসে। **বিশের দশকে** সে স্থবিরতা কেটে গেলে বাংলা নাট্যজগতে দেখা যায় বিপুল পরিবর্তন। সামাজিকভাবে নাটক অভিজাত শ্রেণির নিকট শিল্পমাধ্যম হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেই নাট্যকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনিভিত্তিক নাটকের চেয়ে সামজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত নাটকের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যে-সকল পৌরাণিক নাটক টিকে যায়, সেগুলির কেন্দ্রস্থলে অতিপ্রাকৃতের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষ। অন্যদিকে টিকে যাওয়া ঐতিহাসিক নাটকে অতিরঞ্জিত বীরগাথার পরিবর্তে ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতি নাট্যকাররা অধিক মনোযোগী হন। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্য কাঠামো অপসৃত হতে থাকে এবং ইবসেন ও বার্নাড শ প্রবর্তিত নাট্য কৌশল সে স্থান অধিকার করে। এ সময়ে প্রযোজনা রীতিতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। **শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯)** প্রবর্তিত অভিনয়রীতি গিরিশ ঘোষের তুলনায় অধিকতর বাস্তবধর্মী হয়ে ওঠে। দলগত অভিনয় (ensemble acting), মঞ্চচিত্রের (stage picture) অর্থপূর্ণ বিন্যাস (composition) এবং অনাড়ম্বর ভাবভঙ্গি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করতে শুরু করে। প্রসেনিয়াম মঞ্চে বাস্তব জীবনের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনার প্রতি অধিকতর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩১ সালে বাংলা নাট্যের আলোকসজ্জা এবং সেট ডিজাইনের

ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন সতু সেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় মঞ্চের মেঝের সম্মুখে স্থাপিত বাতির (ফুট লাইট) ব্যবহার হ্রাস পায় এবং তার পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় মাথার উপরে স্থাপিত নির্দেশাত্মক (directional) আলোক ব্যবস্থা। অঙ্কিত ব্যাকড্রপ প্রথার স্থলাভিষিক্ত হয় বক্সসেট পদ্ধতি। সেট ডিজাইন ও পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কালসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নেপথ্য সঙ্গীত হিসেবে অর্কেস্ট্রার ব্যবহারও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। নাটকের গান ও নাচের গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ববর্তীকালের 'সখীদল' ক্রমশ মঞ্চ থেকে অপসৃত হয়। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়কারী হিসেবে পরিচালকের আবির্ভাব ঘটে, যার ওপর ন্যস্ত হয় অভিনয়, আলো, সেট, পোশাক, সঙ্গীত ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব।

এ কালপর্বের গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার হলেন **মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১), বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬)** এবং আরও কয়েকজন। মন্মথ রায় ১৯২৩ সালে মুক্তির ডাক নামের একাঙ্কিকার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেন এবং একাঙ্কিকা রচনার ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর নাটকে সমকালীন প্রসঙ্গ ও চলতি ঘটনাবলির প্রতিফলন দেখা যায়, যদিও তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। ভাগবতপুরাণ থেকে গৃহীত কাহিনি অবলম্বনে তিনি কারাগার (১৯৩০) নাটক রচনা করেন, যেখানে কংসরূপী ঔপনিবেশিক সরকারের অত্যাচার থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে কৃষ্ণকে তুলে ধরা হয়েছে। কারাগার এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয় এটিকে নিষিদ্ধ করতে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর গৈরিক পতাকার জন্য। যখন দেশব্যাপী চলছিল ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন, ঠিক তখনই গভীর আবেগপ্রবণ ভাষায় স্বদেশপ্রেমের বাণী ঘোষণাকারী এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বাংলা নাট্যে শচীন্দ্রনাথের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো সমাজ সচেতনতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন, যার ফলে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয় ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাট্যকাঠামো পরিহার করে তিনি নাট্য চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন। সে সময়কার নিরীক্ষাধর্মী নাটক ঝড়ের রাতে (১৯৩১) শচীন্দ্রনাথ নারী মনস্তত্ত্বের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করেন এবং নারীর মুক্তি সমর্থন করেন। বিধায়ক ভট্টাচার্য জনসমক্ষে অবতীর্ণ হন তাঁর সামাজিক নাটক মেঘমুক্তির (১৯৩৮) মাধ্যমে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে পরিবর্তনশীল সমাজে শহুরে মধ্যবিত্ত এবং এই শ্রেণির পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব চিত্রায়ণের জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর নাটকের মধ্যে মাটির ঘর (১৯৩৯), বিশ বছর আগে (১৯৩৯), রক্তের ডাক (১৯৪১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মন্মথ, শচীন্দ্রনাথ এবং বিধায়কের উপর্যুক্ত নাটকগুলির মাধ্যমে এ সময়কার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণী মূল্যায়ন তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। রঙ্গালয়সহ শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমগুলিতেও এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য এ সময়কার নেতৃস্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনতায় উদ্বুদ্ধ লেখক-শিল্পিবৃন্দ **'প্রগতিশীল লেখক সংঘ' (১৯৩৬) ও 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর (১৯৪২)** মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে **'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩)** শহরভিত্তিক শিল্পীদের সংগঠিত করে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের গণমানুষের কাতারে সামিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর কিছুকাল পরে বাংলা ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয় এবং এর ফলে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু ও মানবিক দুর্দশার এ তাৎক্ষণিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা বিজন ভট্টাচার্য রচিত নবান্ন নাটকটি মঞ্চস্থ করে। প্রাত্যহিক ভাষায় ঘটমান বাস্তবতার প্রতিফলন এবং অধিকতর জীবন ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে নবান্ন নাটক নাট্য রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করে। সর্বোপরি এ নাটকটি সমাজে নাট্যকর্মী/শিল্পীদের ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নাট্যকলায় রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা যুক্ত করে। এর ফলে কলকাতার নবান্ন-পরবর্তী নাট্যকলায় গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চার উন্মেষ ঘটে এবং এতে নাট্যকর্মিগণ তাঁদের কাজে সামাজিক-রাজনৈতিক সংযুক্তি ও শিল্পোৎকর্ষ এ দুটি বিষয়কে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। সে সময় সাধারণ রঙ্গালয়ে এই ধারণা আর্থিকভাবে অলাভজনক হওয়ায় তাঁরা সবাই নাট্যকর্ম থেকে অর্থগ্রহণে বিরত থাকেন এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে বিকল্প কর্মের সন্ধান করেন।

ঐচ্ছিক বাংলা: AHBNG 203-GE-2
মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, বিজন ভট্টাচার্য

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. http://bn.banglapedia.org থেকে নাট্যকারদের জীবনীর সিংহভাগ অংশ গৃহীত হয়েছে।
২. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, কলকাতা: দেজ, ২০১৪
৩. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, কলকাতা: রত্নাবলী, ২০১০
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৬১
৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ,
৭. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, দ্বিতীয় খণ্ড: নবযুগ, কলকাতা: অরুণা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
৮. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
৯. ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত, মধুসূদন রচনাবলী, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৫
১০. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৫
১১. রথীন্দ্রনাথ রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, গিরিশ রচনাবলী, কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯
১২. অজিতকুমার ঘোষ ও আবজুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, দীনবন্ধু রচনাবলী, কলকাতা: হরফ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ – ১৮৭৩)

- ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে, এক জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল। মা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ হয়। প্রথমে তিনি সাগরদাঁড়ির পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। পরে সাত বছর বয়সে তিনি কলকাতা যান এবং খিদিরপুর স্কুলে দু'বছর পড়বার পর ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৮৩৪ সালে তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইংরেজি 'নাট্য-বিষয়ক প্রস্তাব' আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
- হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ, যাঁরা পরবর্তী জীবনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সহপাঠীদের মধ্যে মধুসূদন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কলেজের পরীক্ষায় তিনি বরাবর বৃত্তি পেতেন। এ সময় নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন।
- হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়েই মধুসূদন কাব্যচর্চা শুরু করেন। তখন তাঁর কবিতা *জ্ঞানান্বেষণ, Bengal Spectator, Literary Gleamer, Calcutta Library Gazette, Literary Blossom, Comet* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এ সময় থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিলেত যাওয়ার। তাঁর ধারণা ছিল বিলেতে যেতে পারলেই বড় কবি হওয়া যাবে।
- তাঁর পিতা বিবাহ ঠিক করলে মধুসূদন ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে তাঁর নামের পূর্বে 'মাইকেল' শব্দটি যুক্ত হয়। কিন্তু হিন্দু কলেজে খ্রিস্টানদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ থাকায় মধুসূদনকে কলেজ ত্যাগ করতে হয়।
- ১৮৪৪ সালে মধুসূদন বিশপস্ কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৪৭ পর্যন্ত এখানে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি ইংরেজি ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শেখার সুযোগ পান। এ সময় ধর্মান্তরের কারণে মধুসূদন তাঁর আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর পিতাও এক সময় তাঁকে অর্থ পাঠানো বন্ধ করে দেন। অগত্যা মধুসূদন ভাগ্যান্বেষণে ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজ গমন করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। প্রথমে *মাদ্রাজ মেইল অরফ্যান অ্যাসাইলাম স্কুলে* (১৮৪৮ – ১৮৫২) এবং পরে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হাইস্কুলে শিক্ষকতা (১৮৫২ – ১৮৫৬) করেন।
- মাদ্রাজের সঙ্গে মধুসূদনের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত। এখানেই তিনি সাংবাদিক ও কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি *Eurasion* (পরে *Eastern Guardian*), *Madras Circulator and General Chronicle* ও *Hindu Chronicle* পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং *Madras Spectator*-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন (১৮৪৮ – ১৮৫৬)।
- মাদ্রাজে অবস্থানকালেই Timothy Penpoem ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *The Captive Ladie* (১৮৪৯) এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ *Visions of the Past* (১৮৪৯) প্রকাশিত হয়।

- ❖ রেবেকা ও হেনরিয়েটার সঙ্গে মধুসূদনের প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ মাদ্রাজেই সংঘটিত হয়। মাদ্রাজে বসেই তিনি হিব্রু, ফরাসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন।
- ❖ এর মধ্যে মধুসূদনের পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা আসেন। সেখানে তিনি প্রথমে পুলিশ কোর্টের কেরানি এবং পরে দোভাষীর কাজ করেন। এ সময় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেও তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন।
- ❖ এসময়ই তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে বাংলায় সাহিত্যচর্চা করতে অনুরোধ জানান এবং তিনি নিজেও ভেতর থেকে এরকম একটি তাগিদ অনুভব করেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের *রত্নাবলী* (১৮৫৮) নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভব করেন এবং তাঁর মধ্যে তখন বাংলায় নাটক রচনার সংকল্প তৈরি হয়। এই সূত্রে তিনি কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এমন একটি পরিস্থিতিতে নাট্যকার হিসেবেই মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ ঘটে।
- ❖ কলকাতায় থাকার এই সময়কালটিকেই বলা চলতে পারে মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যসাধনার প্রথম পর্যায় (১৮৫৯ - ১৮৬২)। দুটি প্রহসন, দুটি নাটক, তিনটি কাব্য এসময় তিনি রচনা করেন।
- ❖ ১৮৬৩ সালে তিনি প্যারিস হয়ে ভার্সাই নগরীতে যান এবং সেখানে প্রায় দুবছর অবস্থান করেন। ভার্সাইতে অবস্থানকালে তাঁর জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এখানে বসেই তিনি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের অনুকরণে বাংলায় সনেট লিখতে শুরু করেন। বাংলা ভাষায় এটিও এক বিস্ময়কর নতুন সৃষ্টি। এর আগে বাংলা ভাষায় সনেটের প্রচলন ছিল না। এই সনেটগুলি ১৮৬৬ সালে *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী* নামে প্রকাশিত হয়।
- ❖ ভার্সাই নগরীতে দুবছর থাকার পর মধুসূদন ১৮৬৫ সালে পুনরায় ইংল্যান্ড যান এবং ১৮৬৬ সালে গ্রেজ-ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন।
- ❖ ১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু ওকালতিতে সুবিধে করতে না পেরে ১৮৭০ সালের জুন মাসে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে যোগদান করেন। দুবছর পর এ চাকরি ছেড়ে তিনি পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। এবারে তিনি সফল হন, কিন্তু অমিতব্যয়িতার কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অমিতব্যয়িতার ব্যাপারটি ছিল তাঁর স্বভাবগত। একই কারণে তিনি বিদেশে অবস্থানকালেও একবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে সেবার উদ্ধার পান।
- ❖ ১৮৭২ সালে মধুসূদন কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও-এর ম্যানেজার ছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে তিনি একটি অসম্পূর্ণ নাটক ও অসম্পূর্ণ গদ্যরচনা করেছিলেন।
- ❖ মধুসূদনের শেষজীবন অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। ঋণের দায়, অর্থাভাব, অসুস্থতা, চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদি কারণে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। শেষজীবনে তিনি উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বসবাস করতেন। স্ত্রী হেনরিয়েটার মৃত্যুর তিনদিন পরে ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন বাংলার মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কপর্দকহীন অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

নাট্যসাহিত্য

শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯)

তথ্য ও আলোচনা

(১) সম্ভবত ১৮৫৮ সালের ১৬-ই জুলাই-এর মধ্যে নাটকটি লেখা সম্পূর্ণ হয়। **১৮৫৯** সালের জানুয়ারি মাসের ৯ থেকে ১৯ তারিখের মধ্যে নাটকটি প্রকাশিত হয়।

(২) ১৮৫৮ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা *রত্নাবলী* নাটকের অভিনয় হয় বেলগাছিয়া নাট্যশালায়। এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করতে গিয়ে মধুসূদন বাংলায় উচ্চমানের মৌলিক নাট্যসাহিত্যের অভাব অনুভব করেন। এরপর পাইকপাড়ার রাজাদের উৎসাহে তিনি এই নাটকটি রচনা করেন।

(৩) মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানীর কাহিনি এর আখ্যানবস্তু।

(৪) এই নাটকটি মধুসূদন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে উৎসর্গ করেছিলেন।

(৫) মধুসূদন নিজে *শর্মিষ্ঠা নাটক*-এর 'বিদেশি সৌরভের' কথা বললেও এ নাটকে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভূত প্রভাব রয়েছে। ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন:

> "বিদূষক চরিত্রকল্পনায়, নাট্যসংলাপে বর্ণনাত্মক রীতির একাধিপত্যে, চরিত্রসৃষ্টিতে জটিলতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভাবে, রত্নাবলী-বিক্রমোর্ব্বশী-মালবিকাগ্নিমিত্র-জাতীয় ত্রিভুজ প্রেমকে কেন্দ্র করে

নাট্যগঠনরীতিতে সংস্কৃত আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। কালিদাসের ভাষাভঙ্গিও বহুক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন কবি।...

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকেও নাটকটি ব্যর্থ ও বৈশিষ্ট্যহীন। যযাতিকে আমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, দুর্বলচিত্ত এবং শিথিল চরিত্রের ব্যক্তি হিসেবেই এখানে পেয়েছি। শর্মিষ্ঠা কতকটা প্রশান্ত কল্যাণময়ীরূপে মৌন সহনশীলতা নিয়েই দেখা দিয়েছে। দেবযানী চরিত্রে কঠোর ব্যক্তিত্ব সামান্যত পথ করে নেবার চেষ্টা করেছে।" (মধুসূদন রচনাবলী: সাহিত্য সংসদ)

(৬) সংস্কৃতানুগ সাংলকারা সংলাপ, অভিনয়োপযোগী দৃশ্যরূপের অনুপস্থিতি এবং কাহিনীপরিকল্পনাগত ত্রুটিও এই নাটকে দেখা যায়।

(৭) ভারতীয় ও ইওরোপীয় নাট্যদর্শের মধ্যে মেলবন্ধন করবার চেষ্টায় মধুসূদন যে এখানে খুব একটা সফল হতে পারেন নি একথা অনস্বীকার্য।

(৮) ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে *শর্মিষ্ঠা নাটক* বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয়।

চরিত্র **পুরুষ চরিত্র :** যযাতি, মাধব্য (বিদূষক), শুক্রাচার্য, কপিল (শুক্রাচার্যের শিষ্য), বকাসুর, অন্যান্য গৌণ চরিত্র
স্ত্রী চরিত্র : দেবযানী, শর্মিষ্ঠা, পূর্ণিমা (দেবযানীর সখী), দেবিকা (শর্মিষ্ঠার সখী), অন্যান্য গৌণ চরিত্র

অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজন

অঙ্ক	গর্ভাঙ্কের সংখ্যা
প্রথমাঙ্ক	২
দ্বিতীয়াঙ্ক	২
তৃতীয়াঙ্ক	৩
চতুর্থাঙ্ক	৩
পঞ্চমাঙ্ক	২

মোট অঙ্ক = ৫
মোট গর্ভাঙ্ক = ১২

একেই কি বলে সভ্যতা ? (১৮৫৯)

তথ্য ও আলোচনা

(১) *শর্মিষ্ঠা* নাটকের রচনা শেষ হবার অব্যবহিত পরেই মধুসূদন দুটি প্রহসন রচনা করেছিলেন, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য। কিন্তু প্রভাবশালী মহল থেকে এজাতীয় নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে আপত্তি ওঠায় দুটি প্রহসনই সেসময় অভিনীত হয় নি। অভিনয় না হওয়ায় মধুসূদন আশাহত হয়েছিলেন: "Mind you broke my wings once about the farces."

(২) ১৮৬০ সালের প্রথমদিকে এই প্রহসন দুটি ছোট রাজার অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়।

(৩) প্রথম প্রকাশের সময় *একেই কি বলে সভ্যতা?*-র পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩৮।

(৪) মধুসূদনের জীবৎকালে এই প্রহসন দুটির আর একটি মাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যদিও তাতে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল না। এই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশসাল ১২৬৯ বঙ্গাব্দ (১৮৬২)।

(৫) ১৮৬৫ সালের ১৮ জুলাই শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক *একেই কি বলে সভ্যতা?* অভিনীত হয়।

চরিত্র **পুরুষ চরিত্র:** কর্তা-মহাশয়, নববাবু, কালীবাবু, বাবাজী, বৈদ্যনাথ ইত্যাদি
স্ত্রী চরিত্র: গৃহিনী, প্রসন্নময়ী, হরকামিনী, নৃত্যকালী, কমলা, পয়োধরী, নিতম্বিনী ইত্যাদি

অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজন

অঙ্ক	গর্ভাঙ্কের সংখ্যা
প্রথমাঙ্ক	২
দ্বিতীয়াঙ্ক	২

মোট অঙ্ক = ২
মোট গর্ভাঙ্ক = ৪

বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)

তথ্য ও আলোচনা

(১) ১৮৬০ সালের প্রথমদিকে এই প্রহসন ছোট রাজার অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়।

(২) প্রথম প্রকাশের সময় *একেই কি বলে সভ্যতা?*-র পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৩২।

(৩) মধুসূদনের জীবৎকালে এই প্রহসন দুটির আর একটি মাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যদিও তাতে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল না। এই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশসাল ১২৬৯ বঙ্গাব্দ (১৮৬২)।

(৪) লেখবার সময় মধুসূদন এই নাটকের নাম রেখেছিলেন 'ভগ্নশিবমন্দির'।

(৫) ১৮৬৬ সালের আরপুলি নাট্যসমাজ কর্তৃক *বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ* অভিনীত হয়।

চরিত্র **পুরুষ চরিত্র:** ভক্তপ্রসাদ বাবু, পঞ্চানন বাচস্পতি, আনন্দ বাবু, গদাধর, হানিফ গাজি, রাম

স্ত্রী চরিত্র: ফতেমা (হানিফের পত্নী), ভগী, পঞ্চী

অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজন	**অঙ্ক**	**গর্ভাঙ্কের সংখ্যা**	
	প্রথমাঙ্ক	২	মোট অঙ্ক = ২
	দ্বিতীয়াঙ্ক	২	মোট গর্ভাঙ্ক = ৪

একেই কি বলে সভ্যতা ?

১. এই প্রহসনটি নগরজীবনের আলেখ্য।

২. ইয়ংবেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাব, অনুকরণপ্রিয়তা, মদ্যপানাসক্তি— বাংলার নবযুবকদের সভ্যতার নামে নীতিহীন জীবনযাপন, বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি মোহ, মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞাকে নিপুণ ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন নাট্যকার।

৩. অন্তঃপুরে আবদ্ধ বাঙালি নারীর চরিত্রও ফুটে উঠেছে সাবলীল দক্ষতায়।

৪. এ চরিত্রগুলি মধুসূদনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও অভ্রান্ত লোকচরিত্রজ্ঞানের ফসল।

বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ

১. এই প্রহসনটি গ্রামজীবনের আলেখ্য।

২. গ্রামীন জমিদার ভক্তপ্রসাদের ভণ্ডামী লালসাজর্জরিত মনকে উন্মুক্ত করে দেন মধুসূদন এই নাটকে। একদিকে সে ধর্মের কথা বলে অন্যদিকে গরিব মুসলমান চাষী হানিফের রূপসী ও যুবতী স্ত্রী ফতিমাকে সম্ভোগ করবার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে তার প্রজাদের হাতে জব্দ হয়।

৩. গ্রামজীবন থেকে আহরণ করা চরিত্রগুলি এ প্রহসনে সতেজ ও সাবলীল।

পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০)

তথ্য ও আলোচনা

(১) পদ্মাবতী নাটক লেখা আরম্ভ হয় ১৯ মার্চ, ১৮৫৯ সালের আগে।

(২) ১৮৬০ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে ১৫ মে-র মধ্যে নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল।

(৩) এই নাটকেই প্রথম তিনি কিছু সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করলেন।

(৪) গ্রিক পুরাণের কাহিনি 'Apple of Discord' অবলম্বনে নাটকটি রচিত। কিন্তু গ্রিক-পুরাণকাহিনিটি এ নাটকের কাহিনির মধ্যে অন্তঃস্থ হয়ে রয়েছে। কাহিনিটি এই:

> "The Golden Apple of Discord was created by Eris, the Goddess of Discord. Zeus had thrown a wedding on Mount Olympus for Thetis the sea nymph and mortal Peleus. After Eris found out that she was not invited, she crashed the wedding and threw the apple inscribed with the word "kallisti" or "for the fairest". The goddesses all fought over the apple, but it came down to Hera, Aphrodite and Athena. They asked Zeus to decide who received the apple and he told them that Paris of Troy was to choose the fairest. Each of the goddesses offered him a gift for the apple. Hera offered him the chance to be the king of Asia and Europe. Athena offered him wisdom and to become the world's greatest warrior. Aphrodite offered him the love of Helen of Sparta, who was married to King Menelaus. Paris of Troy gave the apple to Aphrodite. After Paris kidnapped her, Aphrodite kept her promise and gave him the love of Helen of Sparta. King Menelaus and Helen's former suitors refused to rest until she was found. All due to Golden Apple of Discord, the Trojan War had begun."

গ্রিক পুরাণ	**মূল নাটক**	**গ্রিক পুরাণ**	**মূল নাটক**	**গ্রিক পুরাণ**	**মূল নাটক**
জুনো	শচী	**প্যালাস**	মুরজা	**হেলেন**	পদ্মাবতী
ভেনাস	রতি	**প্যারিস**	ইন্দ্রনীল	**এরিস**	নারদ

(৫) ইন্দ্রনীল রতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রূপে অভিহিত করে ও রতির প্রয়াসে সুন্দরী পদ্মাবততীকে লাভ করে। এদিকে শচীর ক্রোধে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর জীবনে নেমে আসে দুঃখ; যদিও শেষ পর্যন্ত সে দুঃখের উপশম হয়।

চরিত্র **পুরুষ চরিত্র :** ইন্দ্রনীল (রাজা), মানবক (বিদূষক), রাজমন্ত্রী, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি অঙ্গিরা, কলি ইত্যাদি

স্ত্রী চরিত্র : শচী দেবী, রতি দেবী, মুরজা দেবী, পদ্মাবতী, বসুমতী (সখী), মাধবী (পরিচারিকা), গৌতমী (তপস্বিনী), রম্ভা (অপ্সরী)

অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজন

অঙ্ক	গর্ভাঙ্কের সংখ্যা	
প্রথমাঙ্ক	গর্ভাঙ্কবিভাজন নেই।	
দ্বিতীয়াঙ্ক	২	মোট অঙ্ক = ৫
তৃতীয়াঙ্ক	২	মোট গর্ভাঙ্ক = ১০
চতুর্থাঙ্ক	৩	
পঞ্চমাঙ্ক	২	

কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১)

তথ্য ও আলোচনা

(১) মধুসূদন রিজিয়ার কাহিনী অবলম্বনে নাটক লেখবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বেলগাছিয়া থিয়েটার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে অভিনেতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শে তিনি টডের লেখা *Annals and Antiquities of Rajasthan* পড়তে থাকেন এবং সেখান থেকেই *কৃষ্ণকুমারী নাটক*-এর বিষয়বস্তু আহরণ করেন।

(২) এই নাটকের রচনাকাল ১৮৬০ সালের ৬ অগাস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর। এই নাটকটি রচনায় হাত দেবার আগে তিনি *মেঘনাদবধ কাব্য* লিখছিলেন। নাটকটির জন্য কিছুদিন মেঘনাদবধ লেখা বন্ধ রাখেন।

(৩) এ নাটকটি লেখা শেষ হবার প্রায় এক বছর পর, ১৮৬১ সালের শেষদিকে এটি প্রকাশিত হয়।

(৪) ১৮৬৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার নাট্যশালায় এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়।

(৫) নাটকের গল্পটি সংক্ষেপে এই:

> উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করবার প্রত্যাশায় জয়পুরের রাজা জয়সিংহ ও মেবারের রাজা মানসিংহ দুজনই উদয়পুর আক্রমণে উদ্যত হন। কৃষ্ণকুমারীর পিতা রাণা ভীমসিংহ প্রবল সংকটের মুখোমুখি হন। একদিকে কন্যার প্রতি ভালোবাসা অন্যদিকে দেশের প্রতি কর্তব্য— কোন দিক রক্ষা করবেন তিনি? শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকুমারী আত্মহনন করে তার পিতাকে এই সংকট থেকে মুক্ত করে।

(৬) কৃষ্ণকুমারী একটি She-tragedy। অবার অনেকে এটিকে শেক্সপীয়রের King Lear-এর অনুসরণে রাণা ভীমসিংহের ট্র্যাজেডি হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন।

চরিত্র

পুরুষ চরিত্র : ভীমসিংহ (উদয়পুরের রাজা), বলেন্দ্রসিংহ (রাজভ্রাতা), সত্যদাস (রাজমন্ত্রী), জগৎসিংহ (জয়পুরের রাজা), নারায়ণ মিশ্র (রাজমন্ত্রী), ধনদাস (রাজসহচর) ইত্যাদি

স্ত্রী চরিত্র : অহল্যা দেবী (ভীমসিংহের পাটেশ্বরী), কৃষ্ণকুমারী (ভীমসিংহের দুহিতা), তপস্বিনী, বিলাসবতী, মদনিকা

অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজন

অঙ্ক	গর্ভাঙ্কের সংখ্যা	
প্রথমাঙ্ক	২	
দ্বিতীয়াঙ্ক	৩	মোট অঙ্ক = ৫
তৃতীয়াঙ্ক	৩	মোট গর্ভাঙ্ক = ১৪
চতুর্থাঙ্ক	৩	
পঞ্চমাঙ্ক	৩	

মায়া-কানন (১৮৭৪)

তথ্য ও আলোচনা

(১) ১৮৭৩ সালে শরচ্চন্দ্র ঘোষ কলকাতায় 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মধুসূদনকে একটি নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করেন। পারিশ্রমিক পাওয়ার দীর্ঘকাল পরে মধুসূদন এই নাটক রচনায় হাত দেন। *মায়া-কানন* নাটকটি লেখা শেষ হয়। তবে তিনি এটি পরিমার্জনা করে যেতে পারেননি।

(২) কবির মৃত্যুর পর নাটকটি ১৮৭৪ সালের ১৪-ই মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়।

(৩) ক্ষেত্র গুপ্ত নাটকটি সম্পর্কে লিখেছেন:

"মায়াকাননে আদ্যন্ত এক সর্বনাশের সুর বেজেছে। রুষ্ট দৈবের সামনে অসহায় মানুষের বাসনা-কামনা কিরূপ শুষ্ক হয়ে যায়, গভীর প্রেম কেমন করে ডেকে আনে নির্মম মৃত্যু তারই মর্মান্তিক হাহাকারে এ নাটক পূর্ণ।"

(৪) ১৮৭৪ সালের ১৮ এপ্রিল 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ এ নাটকটটির সম্পূর্ণ অভিনয় হয়।

চরিত্র

পুরুষ চরিত্র : বৃদ্ধ রাজা (সিন্ধুদেশাপতি), অজয় (সিন্ধুর রাজকুমার, শেষ রাজা), সিন্ধুরাজমন্ত্রী, গুর্জ্জররাজমন্ত্রী, ভীমসিংহ (গুর্জ্জররাজের সেনানী), রামদাস (অরুন্ধতীর শিষ্য), আত্মা (মৃত সিন্ধুরাজের আত্মা), বৃদ্ধ (বিচারার্থী), মদন (ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী) নৃসিংহ (ঐ বৃদ্ধের কন্যা সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী) ইত্যাদি

স্ত্রী চরিত্র : ইন্দুমতী (গান্ধারের পদচ্যুত রাজা মকরধ্বজের কন্যা), শশিকলা (সিন্ধুরাজের কন্যা), সুনন্দা (ইন্দুমতীর সখী), অরুন্ধতী (তপস্বিনী), সুভদ্রা (বিচারপ্রার্থী বৃদ্ধের কুমারী কন্যা)

অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাজন	**অঙ্ক**	**গর্ভাঙ্কের সংখ্যা**	
	প্রথমাঙ্ক	২	
	দ্বিতীয়াঙ্ক	৩	মোট অঙ্ক = ৫
	তৃতীয়াঙ্ক	২	মোট গর্ভাঙ্ক = ১৩
	চতুর্থাঙ্ক	৪	
	পঞ্চমাঙ্ক	২	

বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার মধুসূদন

- মধুসূদনের নাটকগুলিকে বিষয়বস্তুর বিচারে এই চারটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: **[ক] পৌরাণিক নাটক:** *শর্মিষ্ঠা নাটক* (১৮৫৯), *পদ্মাবতী নাটক* (১৮৬০) **[খ] ঐতিহাসিক নাটক:** *কৃষ্ণকুমারী* (১৮৬১) **[গ] রূপক নাটক:** *মায়াকানন* (১৮৭৪) **[ঘ] প্রহসন:** *একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০); *বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)
- মধুসূদনের নাটকে প্রথম পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ভাবসম্মিলন দেখতে পাওয়া গেল। শর্মিষ্ঠা নাটকের বিষয়বস্তু ও নাট্যরীতি দুই-ই প্রাচ্য ঐতিহ্য থেক গৃহীত। কিন্তু পদ্মাবতী নাটকের বিষয়কল্পনায় রয়েছে পাশ্চাত্য প্রভাব অথচ নাট্যরীতির দিক থেকে তা দেশীয় ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করেনি। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিষয়বস্তু দেশীয় ইতিহাস অথচ নাট্যরীতিতে তা গ্রিক ট্র্যাজেডি নাটকের ধারাকেই অনুসরণ করেছে।
- মধুসূদনের নাটকই মধুসূদনের গদ্য-রচনার প্রমাণ। নাটকের সংলাপ রচনায় তিনি বহুক্ষেত্রে চলিত বাংলা গদ্য ব্যবহার করেছেন। প্রহসনগুলিতে একদিকে যেমন ব্যবহার করেছেন গ্রামের আঞ্চলিক ভাষা, কলকাতার উপভাষা, ভদ্র শ্রেণির ভাষা ও নিচুতলার মানুষের মুখের ভাষা তেমনই অন্তঃপুরের নারীর যে বিশেষ ভাষাভঙ্গি তাও তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর প্রহসনে। ভাষার এই বহুস্তরকে এভাবেই তিনি সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার দিয়েছে, নিজের সাবলীল কলমে তাদের জীবন্ত করে তুলেছেন।
- মধুসূদন উনিশ শতকের বাংলার সার্থকতম প্রহসনকার।
- মধুসূদনের নাটকে সংস্কৃত ও বিদেশি কাব্যের প্রভাব রয়েছে। তার মধ্যে অবশ্য কালিদাস ও গ্রিক নাটকের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।
- মধুসূদন কোনো কাব্যনাটক রচনা করেন নি। কিন্তু নাটকে কাব্যসংলাপের ব্যবহার করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা সে সংলাপই পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যনাটকচর্চার মূলধারাটিকে রচনা করেছিল।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০ – ১৮৭৩)

- পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ। গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়নশেষে পিতার প্রচেষ্টায় স্থানীয় জমিদারের সেরেস্তায় মাসিক আট টাকা বেতনে তিনি চাকরি শুরু করেন (১৮৪০)।
- কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল উচ্চশিক্ষা লাভের তীব্র বাসনা। তাই পাঁচ বছর চাকরি করার পর পিতার অমতেই গোপনে তিনি কলকাতা চলে যান। সেখানে পিতৃব্য নীলমণি মিত্রের আশ্রয়ে শুরু হয় তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভের প্রাণান্ত সংগ্রাম। কলকাতায় পড়াশুনার খরচ জোগাতে দীনবন্ধুকে গৃহভৃত্যের কাজ করতে হয়েছে। প্রথমে তিনি রেভারেন্ড জেমস লংএর অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এ সময়েই তিনি দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি ভর্তি হন কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (বর্তমান হেয়ার স্কুল)। সেখান থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ (১৮৫০) পরীক্ষায় পাস করে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। কলেজের সকল পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি লাভ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বরাবর সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করেন।

- ১৮৫৫ সালে দীনবন্ধু পাটনায় পোস্টমাস্টার পদে যোগদান করেন। এ বিভাগে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে চাকরি করার পর তিনি সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল হন। ১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধের সময় দীনবন্ধু কাছাড়ে সফলভাবে ডাক বিভাগ পরিচালনা করেন, যার জন্য সরকার তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে। কিন্তু কোনও এক কারণে ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হগের অপ্রীতিভাজন হওয়ায় সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেলের পদ থেকে তাঁকে অপসারণ করা হয়। পরে ১৮৭২ সালে তিনি ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্সপেক্টর পদ লাভ করেন।
- দীনবন্ধু কলেজে পড়ার সময়ই ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে আসেন এবং 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। তবে নাটক ও প্রহসন লিখেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। *নীলদর্পণ* (১৮৬০) তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে খ্যাত।
- দীনবন্ধু সমকালীন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রহসন রচনা করেও খ্যাতি অর্জন করেন। সমাজের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিই তাঁর রচনার প্রধান প্রেরণা। চাকরিসূত্রে দেশ-বিদেশ ঘুরে বহুলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর নাটকের চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।
- দীনবন্ধুর দুখানি কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে *দ্বাদশ কবিতা* (১৮৭২) ও *সুরধুনী কাব্য* (১ম ভাগ: ১৮৭১, ২য় ভাগ: ১৮৭৬)। সুরধুনী কাব্য হিমালয় থেকে গঙ্গাদেবীর সাগরসঙ্গমে যাত্রার ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা। এতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন জনপদ এবং বঙ্গদেশ ও সমকালীন কলকাতার বিশিষ্ট স্থান ও স্মরণীয় ব্যক্তিদের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে।
- ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে।

নাট্যসাহিত্য

	নাটক	প্রকাশকাল	প্রকরণ	অন্যান্য তথ্য
১.	নীলদর্পন	১৮৬০	সামাজিক নাটক	সমকালের নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়ন এবং শাসকশ্রেণীর পক্ষপাতমূলক আচরণ নাটকটির বিষয়বস্তু। নাটকটি তৎকালীন সমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং কৃষকদের নীলবিদ্রোহে ইন্ধন জোগায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ করেন (এ তথ্য অবশ্য বিতর্কিত) এবং পাদ্রি জেমস লং তা প্রকাশ করে আদালত কর্তৃক অর্থদন্ডে দন্ডিত হন। বঙ্কিমচন্দ্র নীলদর্পণকে আঙ্কল টমস কেবিন-এর সঙ্গে তুলনা করেন। এটিই বিদেশী ভাষায় অনূদিত প্রথম বাংলা নাটক। "নীলকর-বিষধর-দংশনকাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং" ছদ্মনামে এই নাটকটি প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে এবং ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর এটি দিয়েই শুরু হয় সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়।
২.	নবীন তপস্বিনী	১৮৬৩	রোমান্টিক কমেডি	নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। এই নাটকের সঙ্গে তাঁর লেখা 'বিজয়-কামিনী' উপাখ্যান কাব্যের কাহিনিগত মিল আছে। কৌতুক, রঙ্গরসিকতায় পূর্ণ এ নাটকের সংলাপ।
৩.	সধবার একাদশী	১৮৬৬	প্রহসন	সুরাপান ও আনুষঙ্গিক সামাজিক ব্যধির প্রতিকারের উদ্দেশ্যে লিখিত। এই নাটকের 'নিমচাঁদ' চরিত্রটি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র নবকুমারের আদলে গড়া বলে অনেকে মনে করেন। অজিতকুমার ঘোষের মতে, এটি 'Comedy of Humour'; প্রহসন নয়।
৪.	বিয়ে পাগলা বুড়ো	১৮৬৬	প্রহসন	বৃদ্ধ রাজীবলোচনের নকল বিবাহের আয়োজন ও শেষে তাঁর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা এ প্রহসনের বিষয়। বিষয় পরিকল্পনায় মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-এর প্রভাব আছে।
৫.	লীলাবতী	১৮৬৭	সামাজিক নাটক	শিক্ষিত নাগরিক সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ললিতমোহন ও লীলাবতী তখনখার শিক্ষিত, উদার, ব্রাহ্মমনোভাবাপন্ন, প্রগতিশীল যুবক-যুবতীর প্রতিনিধি। কিন্তু এই শিক্ষিত নাগরিক সমাজের পাশাপাশি গোঁড়া, কুসংস্কারছন্ন এক গ্রাম্য সমাজচিত্রও এ নাটকে দীনবন্ধু অঙ্কন করেছেন।

৬.	জামাইবারিক	১৮৭২	প্রহসন	গ্রামের বিত্তশালী গৃহে ঘরজামাই রাখার প্রথা ও তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অসঙ্গত নানা উদ্ভট ঘটনায় এ প্রহসনটি কৌতুকপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
৭.	কমলে-কামিনী	১৮৭৩	ঐতিহাসিক নাটক	শিখণ্ডীবাহনের জন্মবৃত্তান্তকে প্রথমে রহস্যাবৃত রেখে পরিশেষে সে রহস্য ভেদ করা হয়েছে। এ নাটকেও কৌতুক ও রঙ্গরস রয়েছে অপর্যাপ্ত। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে একে সফল বলা যায় না।
৮.	কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ		প্রহসন	ক্ষুদ্রাকৃতি একটি নক্সা জাতীয় রচনা। হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মরড্যান্ট ওয়েলসকে ব্যঙ্গ করে ও তাঁকে বলদ-পঞ্চানন নাম দিয়ে এই নক্সাটি রচনা করেছিলেন দীনবন্ধু।

বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার দীনবন্ধু

- বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর সাহিত্য-সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ— (১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা (২) তাঁহার প্রবল ও সামাজিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি।" বস্তুত *নবীন তপস্বিনী* ও *কমলে-কামিনী* ছাড়া আর সব নাটকেই তিনি সমসমায়িক সমাজীবনের চিত্রই অঙ্কন করেছেন। দীনবন্ধু যখন সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন তখন বাংলার উনিশ শতকের সমাজ প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের পথানুসন্ধানে ব্যপৃত ছিল। নবীন যা কিছু তার সবই যে অনুকরণীয় নয়; তেমন যা কিছু প্রবীণ— অযৌক্তিক সংস্কার আর মূঢ়তায় বদ্ধ, তাও যে অ-গ্রহণীয় এটাই দীনবন্ধু বলতে চেয়েছেন তাঁর প্রহসনগুলির মধ্য দিয়ে। *সধবার একাদশী* সেই ভ্রান্তদর্শী নবীনের সমালোচনা আর *বিয়ে পাগলা বুড়ো* এবং *জামাই বারিক* মূঢ় প্রাচীনের সমালোচনা।
- বঙ্কিম-কথিত দীনবন্ধুর ঐ 'প্রবল ও সামাজিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি'-র কারণেই দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি শুধু রঙ্গব্যঙ্গের আধারমাত্র নয়।
- নাটকের সংলাপ রচনায় দীনবন্ধু মধুসূদনের উত্তরসূরি। একদিকে যেমন ব্যবহার করেছেন গ্রামের আঞ্চলিক ভাষা, কলকাতার উপভাষা, ভদ্র শ্রেণির ভাষা ও নিচুতলার মানুষের মুখের ভাষা তেমনই অন্তঃপুরের নারীর যে বিশেষ ভাষাভঙ্গি তাও তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর প্রহসনে।
- দীনবন্ধু শুধু সাহিত্যরচনার জন্য নাটক রচনা করেন নি, তিনি সমাজের প্রতি এক গভীর দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪ - ১৯১১)

- ১৮৪৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাগবাজারে তাঁর জন্ম। পিতা নীলকমল ঘোষ ছিলেন মার্চেন্ট অফিসের হিসাবরক্ষক। মা ছিলেন সিমলার বিখ্যাত বসু বংশের কন্যা। মামা নবীনকৃষ্ণ বসু (এঁর প্রভাব গিরিশচন্দ্রের জীবনে অত্যন্ত বেশি)। গিরিশচন্দ্র পিতার ৮ ম সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্রসন্তান (তাঁর পিতার মোট ১২ টি সন্তান)। তিনি প্রথমে হেয়ার স্কুল এবং পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বাল্যকালে পিতামাতার মৃত্যু হলে গিরিশচন্দ্র লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগী হয়ে ওঠেন। ১৮৫৯ সালে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৬২ সালে পাইকপাড়া স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। অবশ্য পরবর্তী জীবনে তিনি বন্ধু ব্রজবিহারী সোমের প্রভাবে প্রচুর পড়াশোনা করেন।
- অধ্যয়ন পর্বের সমাপ্তি ঘটলে গিরিশচন্দ্রের জীবনে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় শ্বশুরের প্রচেষ্টায় তিনি এ্যাটকিনসন টিলকন কোম্পানিতে শিক্ষানবিশের চাকরিতে যোগদান করেন। পরে উক্ত অফিসে একজন দক্ষ বুক-কিপার হন। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ সময় নানা বিষয় অধ্যয়ন করে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাবে তিনি প্রথমে গান ও কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং পরে নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হলে নাটকও লিখতে থাকেন।
- 1870 সালের গোড়ার দিকে empiricism এর প্রভাবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রচন্ড নাস্তিক। এরপর তাঁর প্রিয় দুই অনুজের অকালপ্রয়াণ হয় 1874 সালে এবং এইসময়-ই তাঁর প্রথম পত্নীর মৃত্যু হলে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎকারে গিরিশচন্দ্রের ভক্তির উদ্রেক হয়নি। দ্বিতীয়বার, বলরাম বসুর বাড়িতে কীর্তনের আসরে তাঁর প্রথম ভক্তির উদ্রেক হয়। নাস্তিক গিরিশ ক্রমে আস্তিক গিরিশ হয়ে উঠতে থাকেন।
- ১৮৬৭ সালে বাগবাজার সখের যাত্রাদল-প্রযোজিত মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের গীতিকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। পরে দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটকে তিনি নিমচাঁদ চরিত্রে অভিনয় করেন।
- ১৮৭২ সালে বাগবাজার দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে অভিনয় আরম্ভ করে। কিন্তু মতপার্থক্যের কারণে গিরিশচন্দ্র কয়েকজন অনুগামীসহ দলত্যাগ করেন।
- ১৮৮০ সালে তিনি পার্কার কোম্পানির চাকরি ত্যাগ করে কম বেতনে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর ম্যানেজার হন। তাঁর রচিত প্রথম মৌলিক নাটক *আগমনী* (১৮৭৭) এ মঞ্চেই অভিনীত হয়। মুকুটাচরণ মিত্র ছদ্মনামে তিনি এই নাটক লিখেছিলেন।

- **১৮৮৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর** স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ গিরিশচন্দ্রের **চৈতন্যলীলা** নাটকের অভিনয় দেখতে এসে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব চৈতন্যচরিত্রে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এ ঘটনার প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের মনে ধর্মীয় পরিবর্তন আসে এবং তিনি রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।
- পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত তাঁর নাটকের সংখ্যা মোট ৮০। এগুলি ছাড়া গিরিশচন্দ্র শেকসপীয়রের *ম্যাকবেথ* নাটকের বাংলা অনুবাদ (১৮৯৩) করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের *মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও দুর্গেশনন্দিনী* উপন্যাস, মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য*ও নবীনচন্দ্রের *পলাশীর যুদ্ধ* কাব্যের নাট্যরূপ দেন।
- তিনি অধিকাংশ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে নিজেই অভিনয় করেছেন এবং বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে অভিনয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। অভিনয় শেখানোর জন্য একটি অভিনয়-শিক্ষার স্কুলও তিনি গড়ে তুলেছিলেন।
- মধুসূদনের চৌদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙ্গে তিনি অভিনয়ের উপযোগী একটি ছন্দ তৈরি করেন। এ ছন্দের নাম 'গৈরিশ ছন্দ'।
- ১৮৮৩ – ১৯০৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর গিরিশচন্দ্র স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক, কোহিনূর প্রভৃতি রঙ্গালয় পরিচালনার পর পুনরায় ১৯০৮ সালে মিনার্ভার নাট্যাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
- বাংলায় সর্বাধিক সংখ্যক নাটক রচয়িতা গিরিশচন্দ্র মঞ্চাভিনয়ের প্রথম যুগে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অভিনয় প্রতিভাবলে এক জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হন। ১৮৭৭ সালে *মেঘনাদবধ কাব্যে* রামচন্দ্র ও মেঘনাদ উভয় ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে *সাধারণী* পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেন।
- ১৯১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি এ মহান অভিনেতা ও নাট্যকার কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

David Garrick (১৭১৭ -১৭৭৯) ছিলেন ইংলন্ডের বিখ্যাত অভিনেতা, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক। অষ্টাদশ শতকের এই ব্যক্তির খ্যাতি ছড়িয়েছিল মূলত তাঁর অভিনয় প্রতিভার কারণে। শেক্সপিয়ারের রিচার্ড দ্যা থার্ড, কিং লিয়ার প্রভৃতি নাটকে নামভূমিকায় তাঁর অভিনয় খ্যাতি অর্জন করেছিল। উনিশ শতকে ইংলন্ডে তাঁর নামে দুটি (গ্যারিক থিয়েটার) নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সুকুমার সেন কৃত বিন্যাস (কালানুযায়ী ৫ টি স্তরে বিন্যাস):

(১) গীতিনাট্য ও অপেরা স্তর (১৮৭৩ - ১৮৮১)

(২) পৌরাণিক নাট্যের স্তর (১৮৮১ – ১৮৮৪)

(৩) অবতার-মহাপুরুষ চরিত্রনির্ভর নাট্যরচনা (১৮৮৪ – ১৮৮৯)

(৪) গার্হস্থ ট্র্যাজেডি ও বিয়োগান্ত পৌরাণিক নাটকের পর্ব (১৮৮৯ – ১৯০৫)

(৫) ঐতিহাসিক-দেশপ্রেমমূলক নাট্য-পরম্পরা (১৯০৫ – ১৯১১)

পরের পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য....

গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিন্যাস (প্রকরণ অনুযায়ী):

(১) নাট্য-রূপান্তর ও বিদেশী নাটকের অনুবাদ

সাল	নাট্য-রূপদান
১৮৭৩	কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
১৮৭৭	মেঘনাদবধ (মধূসূদন দত্ত), যমালয়ে জীবন্ত মানুষ (দীনবন্ধু মিত্র)
১৮৭৮	বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), পলাশীর যুদ্ধ (নবীনচন্দ্র সেন)
১৮৮২	মাধবীকঙ্কণ (রমেশচন্দ্র দত্ত)
১৮৯৯	
১৯০০	কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম (বঙ্কিমচন্দ্র)
১৯০৬	

সাল	নাটকের অনুবাদ ও দেশীয় রূপান্তর
১৮৯৯	ম্যাকবেথ (শেকসপিয়ার)
১৯০৬	য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (মঁলিয়ের ‘লাঁমুর মেদিসা থেকে’)

(২) পৌরাণিক ও মহাপুরুষ জীবন-নির্ভর নাটক

সাল	মহাপুরুষ জীবন-নির্ভর নাটক
১৮৮৪	চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদচরিত্র, নিমাইসন্ন্যাস,
১৮৮৭	বুদ্ধদেব চরিত, রূপ-সনাতন
1896	কালাপাহাড়
১৯০৯	শঙ্করাচার্য
১৯১১	অশোক

সাল	পৌরাণিক নাটক
১৮৮১	রাবণবধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, লক্ষণ বর্জন
১৮৮২	সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতাহরণ
১৮৮৩	পান্ডবের অজ্ঞাতবাস, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব-চরিত্র, কমলে কামিনী
১৮৮৪	বৃষকেতু, শ্রীবৎসচিন্তা
১৮৮৫	প্রভাসযজ্ঞ
১৮৮৬	বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, পূর্ণচন্দ্র
১৮৮৭	নল-দময়ন্তী
১৮৯৪	জনা
১৮৯৫	করমেতি বাঈ
১৯০০	পান্ডব গৌরব
১৯০৫	হরগৌরী
১৯১১	তপোবল

(৩) বিয়োগান্ত সামাজিক নাটক

সাল	বিয়োগান্ত সামাজিক নাটক
১৮৮৮	নসীরাম
১৮৮৯	প্রফুল্ল
১৮৯০	হারানিধি
১৮৯৭	মায়া বসান
১৯০৫	বলিদান
১৯০৮	শাস্তি কি শান্তি

(৪) ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেম মূলক নাটক

সাল	ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেম মূলক নাটক
১৮৮১	আনন্দ রহো (কল্পিত, ইতিহাসাশ্রয়ী)
১৮৯০	চন্ড
সাল	**ঐতিহাসিক ও দেশপ্রেম মূলক নাটক**
১৯০৫	সিরাজদ্দৌলা
১৯০৬	মীরকাসিম, বাসর
১৯০৭	ছত্রপতি শিবাজী

(৫) গীতিনাট্য ও রূপকনাট্য

সাল	গীতিনাট্য/ রূপকনাট্য
১৮৭৭	আগমনী, অকালবোধন (২ টিই লেখেন মুকুটাচরণ মিত্র ছদ্মনামে)
১৮৭৮	দোললীলা
১৮৮১	মায়াতরু, মোহিনী প্রতিমা
১৮৮২	ব্রজবিহার, মলিনমালা
১৮৮৪	হীরার ফুল
১৮৯০	মলিনা-বিকাশ, মহাপূজা
১৮৯৪	স্বপ্নের ফুল
১৮৯৬	ফণির মণি
১৮৯৯	দেলদার
১৯০০	হীরক জুবিলি, মণিহরণ, পারস্য প্রসূন, নন্দদুলাল
১৯০১	অশ্রুধারা, অভিশাপ
১৯০২	শান্তি

(৬) সামাজিক ব্যঙ্গ প্রহসন নকশা, পঞ্চরং ও অন্যান্য

সাল	সামাজিক ব্যঙ্গ; প্রহসন; নকশাজাতীয়; পঞ্চরং	অন্যান্য
১৮৭৭		সপ্তমীতে বিসর্জন
১৮৮২	আলাদিন, ভোটমঙ্গল	
১৮৮৬	বেল্লিক বাজার	
১৮৯২		মুকুল মঞ্জুরা
১৮৯৪	বড়দিনের বকশিশ, সভ্যতার পান্ডা	
১৮৯৬	পাঁচ কনে	আবু হোসেন
১৯০১		মনের মতন
১৯০২	আয়না	ভ্রান্তি
১৯০৪		সৎনাম ও বৈষ্ণবী

বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

- "নাট্যরচনার সংখ্যাধিক্যে গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার নাট্যকারগণকে হারাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বৈচিত্রহীনতার জন্য এই সংখ্যাধিক্যের মূল্য খুব বেশি নয়। গীতিনাট্যের কথা বাদ দিলে তাঁহার প্রায় পঁয়তাল্লিশখানি মুখ্য রচনার বদলে চারখানি মাত্র লিখিলে তাঁহার যশোহানি হইত না।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড)
- "নাট্যরচনার আদর্শ গিরিশ পাইয়াছিলেন প্রধানত দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বসুর রচনা হইতে। ভক্তিরসময় পৌরাণিক নাট্যরচনার সূত্রপাত করেন মনোমোহন। গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ট্র্যাজেডির আদর্শ গিরিশ পাইয়াছিলেন দীনবন্ধুর লেখা হইতে।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড)
- "সমসাময়িক ও পূর্বগামীদের কাছে গিরিশচন্দ্রের ঋণ তত ভারি নয়, যত ভারি তাঁহার কাছে অনুবর্তীদের ঋণ। "গৈরিশ" ছন্দ গিরিশচন্দ্রের আবিষ্কার নয়। তাঁহার পূর্ব্বে ব্রজমোহন রায় নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায় কাব্য ভাঙা মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দের অল্পস্বল্প ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের দ্বারাই নাটকে ও অবিনয়ে এই ছন্দের সার্থক প্রয়োগ হইয়াছিল,..." (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড)
- "গিরিশের নাটকের প্রধান ভূমিকাগুলি প্রায়ই অতিরঞ্জনের জন্য সম্ভাব্যতাকে ছাড়াইয়া গেছে। যেন কতকগুলি অসম্ভবরকম ভালো ও অসম্ভবরকম মন্দ লোক অসম্ভবরকম ভালো ও মন্দ কাজ করিয়া যাইতেছে।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড)
- "তিনি সে যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে ঐতিহাসিক নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু বিশুদ্ধ নাটক রচনার দাবি মেটাতে পারেননি।" (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*)
- "গিরিশের নাটকে উঁচুদরের সাহিত্যশিল্পের বিশেষ পরিচয় নাই। তবে যাহাদের জন্য লিখিতেন তাহাদের রসবোধের পরিধি তাঁহার গোচর ছিল। সুতরাং ভাবোচ্ছ্বাসিত প্রেক্ষাগৃহের প্রশংসাধ্বনি তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই।... গিরিশের রচনার প্রধান গুন সারল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩ – ১৯১৩)

- ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। পিতা সুকণ্ঠ গায়ক কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের দেওয়ান এবং মাতা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর বংশধর। তাঁর দুই অগ্রজ রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এবং এক ভ্রাতৃজায়াও সাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।
- দ্বিজেন্দ্রলাল হুগলি কলেজ থেকে বিএ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ (১৮৮৪) পাস করেন। এরপর তিনি কিছুদিন চাকরি করেন।
- দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারি বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য লন্ডন যান এবং ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিলেতে কাটান। লন্ডনের সিসেসটার কলেজ থেকে তিনি কৃষিবিদ্যায় এফ.আর.এ.এস ডিগ্রি এবং রয়েল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটির এম.আর.এ.সি ও এম.আর.এস.এ উপাধি লাভ করেন। বিলেত থেকে ফিরে তিনি মধ্যপ্রদেশে জরিপ ও রাজস্ব নিরূপণ ট্রেনিং নেন এবং সরকারি ডেপুটির চাকরি পান; পরে তিনি দিনাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন।

- ❖ দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা মানুষ; এজন্য কর্মক্ষেত্রে তিনি অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। ১৮৯০ সালে বর্ধমান এস্টেটের সুজামুটা পরগনায় সেটেলমেন্ট অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রজাদের স্বার্থে ছোটলাটের বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হননি। বিলেত থেকে ফেরার পর প্রায়শ্চিত্ত করার প্রশ্ন উঠলে তিনি তা অস্বীকার করেন এবং এজন্য তাঁকে অনেক বিড়ম্বনা সইতে হয়। সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে তাঁর *একঘরে* (১৮৮৯) নামক প্রহসনে।
- ❖ দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯০৫ সালে কলকাতায় 'পূর্ণিমা মিলন' নামে একটি সাহিত্যিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তখনকার শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসেবী বাঙালিদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এ সময় তিনি 'ইভনিং ক্লাব' নামে অপর একটি সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন যার মাধ্যমে তিনি প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। বিলেতে থাকা অবস্থায় তিনি সেখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়-কৌশল ও রঙ্গালয়-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে নাটক রচনা ও অভিনয়ে তাঁকে গভীরভাবে সহায়তা করেছিল।
- ❖ দ্বিজেন্দ্রলাল কৈশোরেই কাব্যচর্চা শুরু করেন। ছাত্রজীবনে তাঁর *আর্য্যগাথা* (১ম ভাগ: ১৮৮২) এবং বিলেতে থাকাকালে *Lyrics of Ind* (১৮৮৬) কাব্য প্রকাশিত হয়।
- ❖ দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতশিক্ষার হাতেখড়ি পিতার নিকট। পিতার কাছে তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাথমিক পাঠ লাভ করেছিলেন। পরে বিলেত বাসকালে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেন। তাছাড়া ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর ভাগলপুর ও মুঙ্গেরে থাকার সময় প্রখ্যাত খেয়ালগায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সুরেন্দ্রনাথ খেয়ালগানে টপ্পার চাল মিশিয়ে এক ধরনের চমৎকার গান গাইতেন, যাকে বলা হয় টপখেয়াল। এ রীতিও দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মস্থ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি ও নাট্যকারই নন তিনি একজন সফল গীতিকার ও সুরস্রষ্টাও। উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা গানের আধুনিকীকরণে যাঁরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম। তিনি প্রায় পাঁচশত গান রচনা করেছেন। প্রথমদিকে তাঁর গান 'দ্বিজুবাবুর গান' নামে পরিচিতি ছিল; পরবর্তীকালে তা 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' নামে পরিচিত হয়।
- ❖ দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৮৭ সালে এগারো বছর বয়সী সুরবালা দেবীকে বিবাহ করে সংসারজীবন আরম্ভ করেন। এ সময়কালে দাম্পত্যসুখমগ্ন দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন অপূর্ব সব প্রেমের গান, যা ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত আর্য্যগাথা-র দ্বিতীয়ভাগে স্থান পায়।
- ❖ ১৯০৩ সালে স্ত্রী সুরবালার মৃত্যু দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনে। আনন্দ ও হাসির গান রচনার ভুবন থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশে যে গণজাগরণমূলক গান রচনার প্রচলন শুরু হয়, তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান ছিল অসামান্য। এ সময় তিনি প্রচুর দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন যা স্বদেশীদের উদ্দীপিত করেছিল।
- ❖ ১৯১৩ সালের ১৭ মে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নাট্যসাহিত্য

	নাটক			
সাল	**ঐতিহাসিক নাটক**	**সামাজিক নাটক**	**নাট্যরঙ্গ ও প্রহসন**	**নাট্যকাব্য**
১৮৮৯			একঘরে	
১৮৯৫			কল্কি-অবতার	
১৮৯৭			বিরহ	
১৯০০			ত্রহ্যস্পর্শ	পাষাণী
১৯০২			প্রায়শ্চিত্ত	
১৯০৩				তারাবাঈ *
১৯০৫	প্রতাপসিংহ			
১৯০৬	দুর্গাদাস			
১৯০৮	নূরজাহান মেবার-পতন		সোরাব-রুস্তম	সীতা *
১৯০৯	সাজাহান			

১৯১১	চন্দ্রগুপ্ত		পুনর্জন্ম	
১৯১২		পর পারে		
১৯১৪	ভীষ্ম *			
১৯১৫	সিংহলবিজয়			
১৯১৬		বঙ্গ নারী		

- *তারাবাঈ* একটি ঐতিহাসিক নাটকও বটে। অর্থাৎ এটি একটি ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য।
- *ভীষ্ম* নাটকটি 'ঐতিহাসিক নাটক' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, এটি প্রকৃত অর্থে পৌরাণিক নাটক। *সীতা*-ও পৌরাণিক নাটক; অর্থাৎ পৌরাণিক নাট্যকাব্য।
- *আনন্দবিদায়*-কে ব্যঙ্গকাব্য বলা হয়েছে বটে কিন্তু এটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। তাই এই প্যারডি জাতীয় ব্যঙ্গকাব্যটিকে প্রহসন বলেও অভিহিত করা যেতে পারে।
- *গান* নামক গীতিসংকলনটিতে মোট ২৩০টি গীতি রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

- মোগল এবং রাজপুত এই দুই বীর জাতিকে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। *দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবারপতন* প্রভৃতি নাটকগুলিতে রাজপুতদের বীরত্ব, আত্মমর্যাদা, ও দেশপ্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট। *দুর্গাদাস,* ও *মেবারপতন* নাটকের উৎস টডের *Annals and Antiquities of Rajasthan*। তবে উৎস-গ্রন্থটির যথাযথ অনুসরণ করেননি দ্বিজেন্দ্রলাল।
- *নূরজাহান* ও *সাজাহান* নাটকগুলি যথাক্রমে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে রচিত।
- *চন্দ্রগুপ্ত* ও *সিংহল বিজয়* এই দুটি নাটকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রাচীন ভারতবর্ষের হিন্দুযুগ। *চন্দ্রগুপ্ত*-এর নাটকীয় কথাবস্তুর মূল উৎস সংস্কৃত নাটক *মুদ্রারাক্ষস*।
- দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সংলাপে সমসাময়িক বঙ্গদেশের দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস আপতিত হয়েছে।
- রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলাল দুটি নাটক লিখেছিলেন: *পাষাণী* ও *সীতা*। *পাষাণী* অমিত্রাক্ষরে ও *সীতা* মিত্রাক্ষরে রচিত। *পাষাণী*-তে রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্যের অনুকরণ প্রচেষ্টা প্রকট।
- ইতিবৃত্তমূলক রোমান্টিক কাহিনি অবলম্বনে লেখা *তারাবাঈ* ও *সোরাব রুস্তম* অমিত্রাক্ষরে রচিত মোলোড্রামা।
- গিরিশচন্দ্র নাটক দ্বারা নিয়ন্ত্রিন বাংলা নাটকের সমসাময়িক ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যরচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর নাটকে আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতা নেই বরং আধুনিক জীবনভাবনার রূপায়ন লক্ষ করা যায়।
- ইওরোপীয় নাট্যরীতির মঞ্চভাবনার আদর্শকে মাথায় রেখে তিনি নাট্যরচনা করেছিলেন। তাঁর সব নাটকই বিশুদ্ধ ইওরোপীয় রীতিতে রচিত।
- নিজে গীতিকার ও কবি ছিলেন। ফলে বাংলা নাটকের ইতিহাস তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যথার্থ উত্তরসূরি।
- "দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিতে প্রায়ই কপটাচারের প্রতি উপহাস আছে। সংলাপে কৌতুকের চেষ্টা আছে কিন্তু সর্বত্র সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তবে হাসির গানগুলি থাকায় অভিনয়ে কৌতুকাবহ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকগুলিতে নাট্যরস জমাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মানসিক দ্বন্দ্বের দ্বারা। লেখক নায়কের ভূমিকায় বীরোচিত রঙ লেপিতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং নায়ক-প্রতিনায়ককে সাধারণত নাস্তিক অথবা অধর্মাচারী করিয়াছেন। বিদূষকের ভূমিকা একেবারে বর্জিত। স্বগতোক্তি প্রচুর এবং সঙ্গত নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় নাই। সংলাপের বৈশাদৃশ্য, বিশেষত কবি উচ্ছ্বাস শোভন নহে।... মোটের উপর মনে হয় নাট্যরচনা যেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের পরম্পরা।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড)
- "দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে "সাজাহান" শ্রেষ্ঠ।" (সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* তৃতীয় খণ্ড)

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গণনাট্য সংঘ হল (ইংরেজি নাম 'Indian People's Theatre Association' বা 'I.P.T.A.') ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা। শুরুর দিকে এর সদস্য ছিলেন: ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, পৃথ্বীরাজ কাপুর, বিজন ভট্টাচার্য, খাজা আহমেদ আব্বাস, সলিল চৌধুরী, পণ্ডিত রবিশংকর, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, নিরঞ্জন সিং মান, এস. টেরা সিং চান, জগদীশ ফরিয়াদি, খলিল ফরিয়াদি, রাজেন্দ্র রঘুবংশী, সফদার মীর প্রমুখ।

প্রগতি লেখক সংঘ

গণনাট্য সংঘের শুরু হয়েছিল প্রগতি লেখক সমিতি সংঘ-এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিতে এবং ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীতে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর থেকে ফ্যাসিবাদীরা অন্য জাতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকেই ইতালির মুসেলিনী এবং জার্মানীর হিটলার-এর কর্মকাণ্ডে ও ঘোষণায় জাতিবিদ্বেষ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এই সময় সারা বিশ্বের সমাজবাদী বুদ্ধিজীবী রম্যাঁ রল্যাঁ, গোর্কি, বারবুঁস, আইনস্টাইন, আন্দ্রে জিঁদ প্রমুখ প্রতিবাদ করেছিলেন এবং একটি আন্তর্জাতিক লেখক সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এই আন্তর্জাতিক লেখক সংঘেরই আদর্শে ভারতীয় লেখকরা গড়ে তোলেন 'প্রগতি লেখক সংঘ'।

লণ্ডন প্রবাসী হীরেন মুখার্জী ও সাজ্জাদ জহির ফ্যাসিজমের আগ্রাসন ও বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনার প্রতিরোধে গড়ে ওঠা এই নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। এঁরা ভারতে ফিরে প্রগতি লেখক সংঘের একটি ইস্তাহার রচনা করেন। পরে এই লেখক সংঘের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন তরুণ লেখক, সাংবাদিক, গীতিকার, নাট্যকার ও কিছু প্রবীণ সাহিত্যিক।
১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-তে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মুন্সি প্রেমচাঁদ। এই সংঘের অন্যতম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন হীরেন মুখার্জী, সাজ্জাদ জহির, মুলক্‌রাজ আনন্দ, জওহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমচন্দ্র প্রমুখ।

১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন: সুধী প্রধান, নীরেন্দ্র রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, সুবোধ চৌধুরী, অরুণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ, বুদ্ধদেব বসু সহ আরও অনেকে। 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর ঘোষণায় বলা হয়—

> "ভারতের নবীন সাহিত্যকে বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।... যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতি বিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজ ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করবো।"

এই সময় কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে এই সংঘের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এর কাছাকাছি সময়েই ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর শাখা। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'League against Fascism and War'। এছাড়া ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রী 'Youth cultural Institute' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের প্রযোজনায় কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এর ভিতরে অন্যতম নাটক ছিল— সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে *অঞ্জনগড়*, সুনীল চ্যাটার্জীর *কেরানী* এবং ইংরেজীতে *In the Heart of Chaina*। এ সময়ে ফ্যাসিবিরোধী ইতালি ও জাপান জার্মানি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে মিলিত হয়ে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবিরোধী মৈত্রী তৈরি করে।

১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে। এই পটভূমিতে ব্যাপকতর ভারতীয় সংগঠনগুলো ভারতীয় জনগোষ্ঠীর কাছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পোঁছে দিয়ে তাদেরকে প্রাণোদ্দীপনায় উজ্জীবিত করার চেষ্টায় করতে থাকেন। এর সাথে যুক্ত হন সে সময়ের উদীয়মান সাহিত্যিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, লোকশিল্পীসহ শিল্পের সকল শাখার কর্মীবৃন্দ। এ সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নানান সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে 'শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে' জনগণের সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়। এই সূত্রে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে (অধুনা মুম্বাই) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে

ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য একটি সাধারণ সংঘ তৈরি করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরই ভিতর দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা সংক্ষেপে I. P. T. A প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কায়ফি আজমী, শান্তি বর্ধন, প্রেমধাবন, বলরাজ সাহনী, শংকর, শৈলেন্দ্র, পৃথ্বিরাজ কাপুর, অমর শেখ প্রমুখ। বাংলার প্রাদেশিক কমিটিতে মনোনীত হন সুনীল চ্যাটার্জী, দিলীপ রায়, সুধী প্রধান, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুজাতা মুখার্জী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, স্নেহাংশু আচার্য, বিষ্ণু দে, বিনয় রায় প্রমুখ। এরপর বাংলাতে প্রায় সকল প্রগতিশীল শিল্পীরাই এর সাথে যুক্ত হন। এঁদের ভিতরে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র, সুরপতি নন্দী, শচীন দেব বর্মণ, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কলিম শরাফি, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, উদয়শংকর, শম্ভু ভট্টাচার্য-সহ শিল্পের সকল শাখার কৃতি মানুষেরা।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নানাবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, শোষণের বিরুদ্ধে শৈল্পিক প্রতিবাদ। এই আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ লেখক শিল্পী নাট্যকর্মীরা এগিয়ে আসেন এবং নতুন নতুন নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হয়। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে মঞ্চস্থ হয় পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত বিজন ভট্টাচার্য রচিত নাটক *আগুন*। একই সময়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের *হোমিওপ্যাথি* অভিনীত হয়। এই ধারার অন্যতম নাটক ছিল ১৯৪২ খ্রিষ্টব্দের আগস্ট বিপ্লব-এর প্রক্ষাপটে *নবান্ন*। *নবান্ন* অভিনীত হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর।

১৯৪৬–৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তেভাগা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। সেই সূত্রে গণনাট্য সংঘের নাট্যকার, অভিনেতা, গীতিকার, কণ্ঠশিল্পীরা গণজাগরণে উদ্দীপনা জুগিয়েছিলেন। নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের পথ ধরে গণনাট্য সংঘের সাথে পরবর্তীকালে যুক্ত হন দিগীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্বগণ।

১৯৪৭-এর বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয় ভারতবর্ষ। ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয় উপমহাদেশ। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট, দেশ যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিনই শ্রীরঙ্গমে *দুঃখীর ইমান* নাটক অভিনয়ের আগে শিশির কুমার ভাদুড়ী বলেছিলেন, "এই স্বাধীনতা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। অস্ত্র এখনও মাউন্টব্যাটেনের হাতে।"

এই সময় 'এই স্বাধীনতা মিথ্যা' বলে একটি নীতি গ্রহণ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। খড়্গহস্ত হয় তদানীন্তন ভারত সরকার। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং পার্টি কর্মীদের প্রতি নেমে আসে নির্যাতন-নিপীড়ন। অন্যদিকে কিছু শিল্পী মনে করেন, পার্টি আদর্শকে নাট্যে-সঙ্গীতে রূপায়িত করার জন্য পার্টির নির্দেশ শিল্পীর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে। নিপীড়নের ভয় কিংবা স্বাধীন শিল্পীসত্তার আগ্রহ, কারণ যাই হোক, ফলস্বরূপ অনেক প্রতিভাবান নাট্যকার ও শিল্পী ১৯৪৮-এই গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে চলে যান। যাঁরা গণনাট্য ছাড়লেন, তাঁদের অনেকেই নতুন নাট্যদল গঠন করেন, নতুন নাটক লেখেন, কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘের চেতনার প্রভাব বা দার্শনিক বিশ্বাস তাদের অন্তরে জাগরুক থেকে গিয়েছিল। এমনকি পেশাদার নাটকেও গণনাট্য সঙ্ঘের চেতনার পরোক্ষ প্রভাব পড়ে।

দ্রষ্টব্য:

১. http://www.onushilon.org/history/ipta.htm
২. http://print.thesangbad.net/literature/sangbadliterature/
৩. দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৯৪
৪. http://www.jnu.ac.bd/journal/assets/pdf/6_2_16.pdf

গণনাট্যের মূল বৈশিষ্ট্য

- নাটকের কাহিনি আবর্তিত হবে জীবনের বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে। কোনো রোমান্টিক কল্পজগতকে কেন্দ্র করে নাট্যকাহিনি বিবর্তিত হবে না। শুধু তাই নয়, যে কোনো 'বাস্তবতা'-র ছবি আঁকলেই হবে না, গণনাট্যকার আঁকবেন শোষিত, নিপীড়িত, দরিদ্র জনসাধারণের জীবনের সমস্যা ও ক্ষোভের ছবি; জীবনের মৌলিক চাহিদার অপূরণজনিত দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ছবি।

- ❖ শুধু বঞ্চনা, নিপীড়ন, উচ্চবিত্তের বা উচ্চশ্রণির দ্বারা হাতে ও ভাতে মার খাওয়া জনসাধারণের জীবনবাস্তবতাটুকু তো গণনাট্য ফুটিয়ে তুলবেই; তার পাশাপাশি এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ কী হতে পারে, সেই সম্ভাব্য ভবিষ্যতের ছবিও গণনাট্যকারকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।
- ❖ কোনো ব্যক্তি নয় গোষ্ঠীই গণনাট্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ব্যক্তির এখানে শ্রেণির প্রতিনিধি মাত্র। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই উজ্জ্বলতম কোনো ব্যক্তি গণনাট্যের নায়ক হয়ে উঠতে পারে। এককথায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র নয়, গোষ্ঠীচেতনাই গণনাট্যের মৌল চরিত্র।
- ❖ সাধারণ দর্শক, বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার জাগরণ ঘটাবে গণনাট্য। এই নাটকরচনার এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ❖ গণ-সঙ্গীতের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকবে গণনাট্যে।

বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬ – ১৯৭৮)

- ❖ খানখানাপুরে বিজন ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক। পিতার কর্মসূত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করার সুবাদে তিনি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হন; ফলে তাদের সংগ্রামী জীবন ও আঞ্চলিক কথ্য ভাষার ছাপ তাঁর রচিত নাটকে পরিলক্ষিত হয়।
- ❖ বিজন ভট্টাচার্য অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০–২২) যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ ও রিপন কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি জাতীয় আন্দোলনে (১৯৩১-৩২) যোগ দেন এবং মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ফলে লেখাপড়ায় (বিএ) ছেদ পড়ে এবং ১৯৩৪-৩৫ সালের ছাত্র আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তিনি বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন।
- ❖ বিজন ভট্টাচার্য কিছুদিন (১৯৩১-১৯৩২) আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি করেছিলেন এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে তিনি আলোচনা, ফিচার ও স্কেচ লেখার কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমদিকে তিনি মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের *অরণি* পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন এবং বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করতে থাকেন।
- ❖ ১৯৪২ সালে সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়া তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জনযুদ্ধ-নীতি প্রচার, ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পিসঙ্ঘ স্থাপন এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘ এবং ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।
- ❖ গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় *নবান্ন* নাটকে বিজন ভট্টাচার্য নিজে অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকে অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ছিলেন তৃপ্তি মিত্র, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, গোপাল হালদার প্রমুখ।
- ❖ বিজন ভট্টাচার্য স্বপ্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপে' (১৯৫০-৭০) ইস্তফা দিয়ে ১৯৭০ সালে 'কবচকুন্ডল' নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং শেষাবধি এর সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।
- ❖ তিনি চলচ্চিত্রেও দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলি হলো: *বাড়ি থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, পদাতিক, যুক্তি তক্কো গপ্পো* ইত্যাদি। এছাড়া তিনি *নাগিন, সাড়ে চুয়াত্তর, বসু পরিবার, তৃষ্ণা, ডাক্তারবাবু* প্রভৃতি ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সালে বিজন ভট্টাচার্য বোম্বাই-এর হিন্দুস্থানী চলচ্চিত্রে অভিনয় ও সিনেমার চিত্রনাট্য লেখার কাজও করেছিলেন। গায়ন ও সুরযোজনায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন।
- ❖ পরবর্তীকালের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, যদিও তাঁদের দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
- ❖ নাট্যজগতে বিশেষ অবদানের মূল্যায়নস্বরূপ কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক আকাদেমি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পুরস্কৃত করে।
- ❖ ১৯৭৮ সালের ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় বিজন ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয়।

নাটক

	সাল	নাটক	প্রকরণ
১.	১৯৪৩	আগুন	পূর্ণাঙ্গ
২.		জবানবন্দী	পূর্ণাঙ্গ
৩.	১৯৪৪	নবান্ন	পূর্ণাঙ্গ
৪.	১৯৪৬	কলঙ্ক	একাঙ্ক
৫.		মরাচাঁদ	একাঙ্ক
৬.	১৯৪৭	অবরোধ	পূর্ণাঙ্গ
৭.	১৯৪৭	জীয়নকন্যা	গীতিনাট্য
৮.	১৯৫০	জননেতা	একাঙ্ক
৯.	১৯৫২	জতুগৃহ	পূর্ণাঙ্গ
১০.	১৯৫৭	গোত্রান্তর	পূর্ণাঙ্গ
১১.	১৯৬০	মরাচাঁদ	পূর্ণাঙ্গ
১২.	১৯৬১	ছায়াপথ	পূর্ণাঙ্গ
১৩.	১৯৬৬	দেবীগর্জন	পূর্ণাঙ্গ
১৪.	১৯৬৬	গর্ভবতী জননী	পূর্ণাঙ্গ
১৫.		জনপদ	পূর্ণাঙ্গ
১৬.		রানী পালঙ্ক	পূর্ণাঙ্গ
১৭.		কৃষ্ণপক্ষ	পূর্ণাঙ্গ
১৮.	১৯৬৭	ধর্মগোলা	পূর্ণাঙ্গ
১৯.	১৯৬৮	সাগ্নিক	একাঙ্ক
২০.	১৯৬৯	গর্ভবতী জননী	পূর্ণাঙ্গ
২১.	১৯৭০	আজ বসন্ত	পূর্ণাঙ্গ
২২.		সর্বর্ণকুম্ভ	রূপকনাট্য
২৩.		লাস ঘুইরা যাউক	একাঙ্ক
২৪.	১৯৭১	সোনার বাংলা	পূর্ণাঙ্গ
২৫.	১৯৭৪	চুল্লী	একাঙ্ক
২৬.	১৯৭৭	চলো সাগরে	পূর্ণাঙ্গ
২৭.		হাঁসখালির হাঁস	একাঙ্ক

বাংলা সাহিত্যে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য

- বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক *আগুন*। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত এই নাটকটি ১৯৪৩ সালের মে মাসে মঞ্চস্থ হয় নাট্য ভারতীতে অভিনীত হয়। এরপর ১৯৪৪ সালের ৩রা জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় *জবানবন্দী*। জবানবন্দী নাটিকা সম্পর্কে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নিজেই বলেছেন: "সেও এক সোনা ধানের দুঃস্বপ্ন-মাঠের রাজা পরাণ মণ্ডল (জবানবন্দীর নায়ক) যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোলকাতার ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে মরেছিল।" চার দৃশ্যের নাটক জবানবন্দী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত। অভাবের জ্বালায় গাঁয়ের মানুষ শহরে আসে আশ্রয় ও জীবিকার আশায়। আর শহরে এসে জোটে অপমান। শিকার হয় ভদ্রলোকদের পৈশাচিক লোভের। নারীরা যৌন লালসার ছোবলে নীল হয়ে ওঠে। ক্ষুধার জ্বালায় বেন্দার বউ-এর দেহ বিক্রয়, অনাহারে পরাণ মণ্ডল, মানিকদের করুণ মৃত্যু দর্শককে শুধু বেদনার্হই করে না ক্ষুব্ধও করে। পরাণমণ্ডল তার শেষ জবানবন্দীতে শোনায় আশার বাণী, নতুন করে বাঁচার ডাক দেয় সে। যে সকল চরিত্র পূর্ববর্তী নাট্যধারায় অপ্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তারাই উঠে এল প্রধান ভূমিকায়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত বা একক দুর্দশার চিত্র নয়, একটা শ্রেণীর সামষ্টিক দুর্দশা, সমষ্টিগতভাবে পীড়িত হওয়ার জন্য সমষ্টিগতভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠার এ চিত্র নতুন এবং গণনাট্য আন্দোলনের জবানবন্দীসহ অপরাপর নাটকে এ চিত্র ও চরিত্র রূপ লাভ করেছে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে, প্রয়োগকৌশলে *জবানবন্দী* সম্পূর্ণ নতুন।
- বিজন ভট্টাচার্যের সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক *নবান্ন*। অভিনীত হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর, শ্রীরঙ্গম রঙ্গালয়ে। চার অঙ্ক ও পনের দৃশ্যে বিভক্ত নাটক। চরিত্র সাঁইত্রিশটি, এছাড়া অন্নহীনের দল ও জনতাও রয়েছে। নাটকটির পটভূমি আগস্ট বিপ্লব (১৯৪২ সালের)। আমিনপুরের একটি চাষী পরিবার প্রধান, প্রধান সমাদ্দার। আগস্ট বিপ্লবে দুই পুত্র হারায়। তারপর শুরু হয় খাদ্যাভাব। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয় আমিনপুর গ্রামের চাষীরা। দু'মুঠো অন্নের আশায় অসহায় চাষীরা একত্রিত হলো শহরে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হলো বেদনাদায়ক। অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে একে একে সবাই আমিনপুরে ফিরে আসে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে চাষ করে সবাই, মিলিত ভাবে বাঁচার শপথ গ্রহণ করে। শুরু হয় নবান্ন উৎসব। প্রতিরোধের তীব্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় নাটকটি। লক্ষণীয়, নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে কৃষক তথা শ্রমজীবী শ্রেণী। একজন নায়কের প্রথাসিদ্ধ ব্যবহার নয়, সমগ্র জনতাই এখানে নায়ক-এই প্রচেষ্টা নতুন। বক্তব্য ও আঙ্গিকে নবান্ন এক নতুন নির্মাণ।
- বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকের বিষয় সচেতনভাবেই নির্বাচন করেছেন। সাহিত্য তাঁর কাছে বামপন্থী আন্দোলনের হাতিয়ার। তাই শোষিত আর নির্যাতিত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তাঁর নাটকর উঠে আসে বারবার। বাঁকুড়ার সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর জীবনালেখ্য উঠে এসেছে *কলঙ্ক* নাটকে; চব্বিশ পরগণার এক যুগসচেতন হতাশ রাজনৈতিক কর্মী ও অন্ধ গায়কের জীবনকাহিনি উঠে

এসেছে *মরাচাঁদ* নাটকে; মুনাফাখোর মিল-মালিক ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব বিষয় হয়ে উঠেছে *অবরোধ* নাটকের। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত *জীয়নকন্যা*। ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গবাসীর ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনি উঠে এসেছে *দেবীগর্জন* নাটকে। তেভাগ আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি লিখেছিলেন *জনপদ* কিম্বা বাদা অঞ্চলের বেদেদের জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খে ফুটিয়ে তুলেছিলেন *গর্ভবতী জননী* নাটকে।

- বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নিজের নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন-

  "বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও তেতাল্লিশের মন্বন্তর আমাকে নাড়া দিয়েছিল। দেখতাম বাচ্চা ছেলে টেলিগ্রাফের তার কাটতে গিয়ে গুলি খেয়ে টুপ করে পড়ে মরত। আমি নিজেও একদিন প্রচণ্ড মার খেলাম। তারপর দুর্ভিক্ষ এল। ক্ষুধিতদের ট্রাজেডির উৎস ও গভীরতা প্রকাশের ক্ষমতা আমার ছিল না, শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, ওরাই যদি ওদের কথা বলতে শুরু করে, ওরা নিজেরাই সামনে এসে দাঁড়ায়..."

- *আগুন*-এ যে চেতনার সূচনা, *জবানবন্দী*-তে তার বিকাশ এবং *নবান্ন* নাটকে তার প্রতিষ্ঠা। *নবান্ন* নাট্যকারের 'সাফল্যের মাইলস্টোন'।

- বিজন ভট্টাচার্যের নাটক সুস্পষ্টভাবেই বিশেষ এক রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত।